বাসদ-এর
বুলেটিন

● বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির মুখপত্র ● মে ২০১৩ ● পাঁচ টাকা

সাভার শ্রমিক গণহত্যা

‘এই নির্মম সভ্যতাকে তোরা দ্রুতবেগে রসাতলে বহিয়া নিয়া যা’

বিশেষ প্রতিবেদন

গত ২৪ এপ্রিল সাভারে ৯ তলা ভবন ধসের ঘটনায় এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য মতে প্রাণ হারিয়েছে ৭ শতাধিক শ্রমিক, নিখোঁজ শতাধিক, চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেছে কয়েকশ। এর আগে গত বছরের নভেম্বর মাসে আশুলিয়ায় তাজরীন গার্মেন্টসে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে মারা যান ১২৪ জন শ্রমিক। ঐ রক্তের দাগ এখনো শুকায়নি। পাঁচ মাসের মাথায় আবারও গণহত্যা ঘটল।

সাভারে ভবন ধসে শত শত শ্রমিকের নির্মম মৃত্যুর সংবাদে দেশ শোকাহত, বিক্ষুব্ধ। কারণ এটা নিছক দুর্ঘটনা নয়, এটা একটা গণহত্যা। ভবনে ফাটল ধরার পরও শ্রমিকদের ডেকে এনে জোর করে কাজ করানো হয়েছে। এখন এও জানা যাচ্ছে যে ওই ভবন কোনো নিয়ম-নীতি মেনে তৈরি করা হয়নি।

জীবন মানুষের সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। ভবনে চাপা পড়া ভয়ার্ত মানুষগুলোকে টিভি চ্যানেলে দেখানো হচ্ছিল। পত্রিকায় তাদের খবর এসেছে। জীবিত-অর্ধমৃত মানুষগুলো চিৎকার করে বলছে, আমি বেঁচে আছি। আমাকে বের করুন। কেউ একটু পানি খেতে চাইছে। তাদের পরিবার-পরিজন ছুটে এসেছে ঘটনাস্থলে – তার প্রিয় মানুষটি বেঁচে আছে কি না তার খোঁজ নিতে। এদের মধ্যে অনেক পরিবারের সন্তানই হয়তো এ ঘটনার পর আর স্কুলে যাবে না, নতুন বিয়ে করা বধূটি হয়তো কাজের খোঁজে রাস্তায় নামবে, কারও বৃদ্ধ পিতা হয়তো বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে। ভবন চাপা পড়া মানুষগুলোর কষ্ট বোঝা যায়, তাদের আর্তনাদ শোনা যায়। কিন্তু এই পিতা, এই স্ত্রী, এই ছেলেমেয়ের নিঃশব্দ কান্না একদিন কালের স্রোতে হারিয়ে যাবে।

এই ঘটনাগুলো ঘটার পেছনে মালিকদের সরাসরি সংশ্লিষ্টতা আছে। বছরের পর বছর ধরে সর্বোচ্চ মুনাফা তোলার জন্য শ্রমিকদের সর্বশক্তি নিংড়ে নেয়ার মাধ্যমে গার্মেন্টস মালিকদের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি ঘটেছে। গার্মেন্টস শিল্প দেশের বৈদেশিক আয়ের প্রধান মাধ্যম হয়েছে। *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সাভারে শ্রমিক গণহত্যার বিচার, নিহত-আহত শ্রমিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণসহ বিভিন্ন দাবিতে গত ৩ মে ঢাকায় গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা ও বাসদের যৌথ বিক্ষোভ

১৬ মে সচিবালয় ঘেরাও

শ্রমিক হত্যার বিচারের দাবিতে বাম মোর্চা ও বাসদের যৌথ বিক্ষোভ

সাভারে শ্রমিক গণহত্যার বিচার, নিহত-আহত শ্রমিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, গণহত্যার জন্য দায়ী ভবন ও গার্মেন্ট মালিকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিসহ বিভিন্ন দাবিতে গত ৩ মে ঢাকায় গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা ও বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি যৌথ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশ থেকে আগামী ১০ মে আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক সমাবেশ এবং আগামী ১৬ মে সচিবালয় ঘেরাও *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

হেফাজতে ইসলামের ১৩ দফা

বাংলাদেশ কি পাকিস্তান-আফগানিস্তানের পথে যাবে?

কওমী মাদ্রাসাভিত্তিক ইসলামী রাজনৈতিক দল-সংগঠন ও মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত হেফাজতে ইসলাম ধর্ম রক্ষার নামে ৫ মে ঢাকা শহরে তাণ্ডব চালিয়েছে। হেফাজতে ইসলামের জমায়েতকে ব্যবহার করে সংঘর্ষ-অগ্নিসংযোগে মূল ভূমিকা পালন করেছে জামাত-শিবির। আর সমর্থন-মদদ দিয়ে বিএনপি ও ১৮ দল একে সরকারবিরোধী আন্দোলনে ব্যবহার করতে চেয়েছে। এরশাদের জাতীয় পার্টি হেফাজতকে সমর্থন দিয়ে ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর চেষ্টা করেছে। হেফাজত নেতৃবৃন্দ এদের সমর্থনকে স্বাগত জানিয়ে ধর্মপ্রাণ মাদ্রাসা ছাত্রদের ক্ষমতা দখলের রাজনীতির দাবাখেলার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। লক্ষ্যণীয়, হেফাজতের ধর্ম অবমাননার অভিযোগ মূলত শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের উদ্যোক্তা ব্লগারদের বিরুদ্ধে যারা একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে আন্দোলন করছেন। শাহবাগের আন্দোলনের পরই হেফাজত ইসলাম রক্ষার নামে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর আগে তারা নিশ্চুপ ছিলেন কেন? শাহবাগের আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কেউ ব্যক্তিগতভাবে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার মত কিছু যদি লিখেও থাকেন, তার জন্য গণজাগরণ মঞ্চ দায়ী হতে পারে না। গণজাগরণ মঞ্চ ভেঙ্গে দেয়া ও এর উদ্যোক্তাদের গ্রেপ্তারের দাবি তোলা হচ্ছে কার স্বার্থে?

কথিত ইসলাম অবমাননার প্রতিবাদে হেফাজতে ইসলাম আন্দোলন শুরু করলেও তাদের দাবি শুধুমাত্র কতিপয় ব্লগারের শাস্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সম্প্রতি তারা যে ১৩ দফা দাবি তুলেছে তার মধ্যে আছে – ‘ইসলামের অবমাননা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা রোধে’ মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে নতুন আইন প্রণয়ন, কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা, ‘প্রকাশ্যে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ’ বন্ধ, রাস্তার মোড়ে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভাস্কর্য স্থাপন বন্ধ করা, কথিত ‘ইসলামবিরোধী’ নারীনীতি ও ‘ধর্মহীন’ শিক্ষানীতি বাতিল, সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে ‘আল-হর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস’ সংযোজন ইত্যাদি। এসকল দাবির যৌক্তিকতা কতটুকু এবং এগুলো বাস্তবায়ন হলে দেশে কি পরিস্থিতি দাঁড়াবে তা গভীরভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন। তবে তার আগে বলা দরকার – হেফাজতে ইসলাম নিজেদের অরাজনৈতিক ব্যানার দাবি করলেও *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সাভারে শ্রমিক গণহত্যার বিচার দাবি

ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে কাজ করতে বাধ্য করে শ্রমিকদের গণহত্যার শিকারে পরিণত করা হয়েছে

বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী সাভার বাসস্ট্যান্ড সন্নিহিত এলাকায় রানা প্লাজা নামক ৯ তলা ভবন ধসে শত শত গার্মেন্টস শ্রমিকের মৃত্যু ও সহস্রাধিক আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক ও ক্ষোভ প্রকাশ করে এর জন্য ভবন মালিকের দায়িত্বহীনতা, গার্মেন্টস মালিকদের মুনাফালোভী মানসিকতা ও সরকারের অবহেলাকে দায়ী করে দোষী ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও শাস্তি দাবি করেছেন। দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২৫ এপ্রিল বিকেল ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন। কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন বাসদ নেতা জহিরুল ইসলাম, ফখরুদ্দিন কবির, সাইফুজ্জামান সাকন, কল্যাণ দত্ত, মলয় সরকার। নেতৃবৃন্দ নিহত শ্রমিকদের পরিবারকে আজীবন আয়ের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং *(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং চালু, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ ও বিদ্যুৎ সংকট-সেচ সংকটসহ

জনজীবনের সংকট নিরসনের দাবিতে দেশব্যাপী বিক্ষোভ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির ডাকে গত ২১ এপ্রিল ’১৩ সারাদেশে বিক্ষোভ দিবস পালিত হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমানো, গ্রাম-শহরের শ্রমজীবীদের জন্য আর্মি রেটে রেশনিং চালু; যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বন্ধ; জ্বালানি তেল-ডিজেলের দাম কমানো, সেচের জন্য ভর্তুকি প্রদান; বিদ্যুতের লোডশেডিং বন্ধ ও লুটপাটের রেন্টাল-কুইকরেন্টাল বন্ধ, রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ এবং ক্ষমতা দখলের দ্বি-দলীয় হানাহানির রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করে বাম-গণতান্ত্রিক বিকল্প গড়ে তোলার দাবিকে সামনে রেখে এ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

শ্রমিক গণহত্যা : নির্মম সভ্যতাকে দ্রুতবেগে রসাতলে বহিয়া নিয়া যা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) অপরদিকে শ্রমিক পরিবারের বুক ফাটা আর্তনাদ বৈদেশিক মুদ্রার ঝনঝনানিতে হারিয়ে গেছে। মজুরি সামান্য বাড়াতে মালিকদের ভীষণ কার্পণ্য। এতে না কি শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে। নিরাপদ কারখানার ব্যবস্থা করতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগটুকু করতেও মালিকরা রাজি নয়। কখনো আগুন লাগে, কলাপসিবল গেট আর অপরিসর সিঁড়ির কারণে শ্রমিক বেরুতে পারে না। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে, পদদলিত হয়ে, আগুনে পুড়ে মরে। কখনো ভবন ধ্বসে পড়ে, কিছু বুঝে ওঠার আগেই চাপা পড়ে শত প্রাণ। প্রতিটি ঘটনায় গণহারে শ্রমিক মারা গেছে, অথচ একবারও মালিকের বিচার হয়নি। এমনকি একজন মালিককেও আদালতের কাঠগড়ায় পর্যন্ত দাঁড়াতে হয়নি। এ এক অপূর্ব দেশ। অপূর্ব তার বিচার ব্যবস্থা। এখানে শ্রমিকের বিচার চাওয়ার অধিকার নেই। গণহত্যা ঘটিয়েও মালিককে এখানে কোনো প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় না। কারণ, তাকে রক্ষার জন্যই দেশের আইন, দেশের সংসদ, দেশের প্রশাসন।

সাভারের ঘটনায়ও এই কথাটিই প্রমাণিত হল। নয়তলা ভবনের ৩য় থেকে ৮ম তলা পর্যন্ত ৫টি পোষাক কারখানা। দ্বিতীয় তলায় ব্র্যাক ব্যাংকের শাখা ও কিছু দোকান। ভবনে ফাটল দেখা গিয়েছিল আগের দিন। সেদিন ৩য় তলায় ফাটল দেখে বিভিন্ন তলায় কর্মরত শ্রমিকরা আতঙ্কে বেরিয়ে যান। তখন সবগুলো কারখানা ছুটি ঘোষণা করা হয়। ব্র্যাক ব্যাংকের শাখাও অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। খবর পেয়ে সাভার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ভবন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন করে তিনি বলেন, ভবন ধসে পড়ার মতো অবস্থা হয়নি, সামান্য ফাটল ধরেছে মাত্র।

ভবনের মালিক সোহেল রানা পৌর যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক এবং স্থানীয় সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা মুরাদ জং-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তিনি আগের দিনও সাংবাদিকদের বলেছেন, ভবন ধসে পড়ার মতো কোনো অবস্থার সৃষ্টি হয়নি।

পরদিন সকালে তাই শ্রমিকরা আতঙ্কে ভবনের সামনে ভীড় করেছিলেন। ভেতরে ঢোকার সাহস পাননি। গার্মেন্টস মালিকরা তা মানবেন কেন? একদিন লোকসানের চেয়ে নিশ্চয়ই শত শ্রমিকের জীবন মূল্যবান নয়। ফলে তাদের জোর করে কাজে ঢোকানো হল। বহুল প্রচারিত একটি দৈনিক পত্রিকা তাই শিরোনাম করেছে 'ডেকে এনে শত প্রাণ হত্যা'। সরকারদলীয় নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় প্রশাসন, ভবন নির্মাণ দেখভালের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত প্রকৌশলী আর মালিক – সবাই মিলে সংগঠিতভাবে এই হত্যাকাণ্ড ঘটালো। এরা সবাই এক। প্রধানমন্ত্রী সংসদে বক্তব্য দিলেন। মালিকদের গাফিলতি নিয়ে কোন কথা বললেন না। জোর করে শ্রমিকদের কাজ করানোর কথা এড়িয়ে গিয়ে বললেন – মালপত্র সরাতে ভবনে লোক ঢুকেছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীরা ধাক্কাধাক্কি করে ভবন ভেঙ্গে ফেলেছেন। প্রশ্ন জাগে – এ রাষ্ট্র কারা চালায়? তাদের কাছে শ্রমিকদের প্রাণের মূল্য কতটুকু?

মাত্র কয়েক মাস আগে গত বছরের অক্টোবরে আশুলিয়ার তাজরিন ফ্যাশন্সে আগুনে পুড়ে অসহায়ভাবে মারা গেছে ১২৪ জন শ্রমিক। আজ পর্যন্ত তাজরিনের মালিককে গ্রেফতার করা হয়নি। একইভাবে বিএনপি-জামাত ৪ দলীয় জোটের আমলে ২০০৫ সালের ১০ এপ্রিল রাতে এই সাভারেই স্পেকট্রাম নামের ৮ তলা ভবন ধসে আনুমানিক ৩ শত শ্রমিক নিহত হয়। ওই ঘটনার জন্য দায়ী মালিক-কর্তৃপক্ষের কোনো শাস্তি হয়নি। বিচার হয়নি ২০০৬ সালে চট্টগ্রামের কেটিএস এপারেল-এ শ্রমিক হত্যার। আর আজ এই বিএনপি-জামাত জোটই শ্রমিকের জন্য মায়া কান্না কাঁদছে।

গত দুই দশকে বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানায় অগ্নিকাণ্ড, ভবন ধসসহ নানা দুর্ঘটনায় প্রায় ১৩ শত শ্রমিক গণহত্যার শিকার হয়েছে। প্রতিটি দুর্ঘটনার কারণ – মালিকরা কারখানায় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার জন্য পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করেনি। শ্রমিকের শ্রমের মতো তাদের জীবনও মালিকদের কাছে সস্তা। মুনাফালোভী মালিকদের পাশাপাশি সরকারও শ্রমিক হত্যার জন্য দায়ী। কারণ, কারখানা আইন মেনে চলতে কোনো সরকারই মলিকদের বাধ্য করেনি এবং কোনো দুর্ঘটনার জন্যই দায়ী কোনো মালিককে এ পর্যন্ত শাস্তি পেতে হয়নি। আওয়ামী লীগ-বিএনপির মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে বিরোধ থাকলেও ধনীদের স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে তারা এক। মালিকদের প্রতি উদার হলেও ন্যায্য মজুরিসহ ন্যায়সঙ্গত দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ দমনে সব সরকারই কঠোর।

এই ভয়াবহ গণহত্যার ঘটনাটি যেদিন ঘটল তার ক'দিন পরই পালিত হল ১ মে। আমাদের দেশবরেণ্য নেতারা এদিন বড় বড় হল হোটেলে গিয়ে, শ্রমিক সমাবেশে দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। কেউ হয়তো সাভারের ঘটনা স্মরণ করে অশ্রুবর্ষণ করেছেন। শ্রমিকহত্যার নায়কেরাই শ্রমিক অধিকারের জয়ধ্বনি দিচ্ছেন। মুহুর্মুহু করতালিতে তাদের বক্তব্যের জয়জয়কার পড়েছে। এসব মিটিংয়ের খাবারের প্যাকেটের মূল্য সামান্য পোশাকশ্রমিকের মাসের বেতনকেও ছাড়িয়ে যাবে। তাদের তৃপ্তির ঢেঁকুরের নিচে শত শ্রমিকের আর্তনাদ, শত মায়ের আহাজারি, শত শিশুর কান্না চাপা পড়বে। কিন্তু শতবর্ষ পূর্বে শিকাগোর হে মার্কেটে যে শ্রমিকের রক্ত 'মে দিবসের' সূচনা করেছিল, আজ শতবছর পরে সাভারের রানা প্লাজায় ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়া শ্রমিক তার কি অর্থ খুঁজে পাবে? শত বছরেও কি এর কোনো পরিবর্তন নেই? এমন করে মৃত্যুই কি নিয়তি?

দেশের লক্ষ কোটি মানুষ আজ তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একদিকে কোটি টাকার বিলাসবহুল জীবন আর অন্যদিকে একটু একটু করে ক্ষুধার অন্ন যোগাড় করতে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া মানুষের দল। একদিকে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ গোটা দেশের সম্পদ করায়ত্ত করে বসেছে, অন্যদিকে লাখো কোটি বুভুক্ষু মানুষ। রাতের বেলা স্টেশনে পা ফেলা যায় না, ফুটপাত ভর্তি মানুষ। এদের ঘর নেই, ঠিকানা নেই, ওরা জানে না কাল কি হবে। জীবন তাদের জন্য এক অজানা গন্তব্য। ওদের শিশুদের শৈশব নেই, বৃদ্ধদের আশ্রয় নেই – নেই কোনো পারিবারিক দাম্পত্য জীবন। এখানে ভালবাসার স্থান নেই, মাতৃস্নেহ কি তা এই রাস্তার শিশুরা জানে না – মায়া মমতার অবশেষটুকু এ সমাজ তাদের মধ্যে রাখেনি। যারা মাথার উপরে ছাদটুকু যোগাড় করতে পেরেছে তারাও জানেনা কাল তা থাকবে কিনা। এখানে পোশাক শ্রমিক, চা-শ্রমিক, মাটি কাটা শ্রমিক, দিনমজুর, মুটে – কারও বেঁচে থাকার মতো মজুরি নেই। অথচ দ্রব্যমূল্য হু হু করে বাড়ছে। একমুঠো ভাত সন্তানদের মুখে তুলে দেয়ার জন্য এদের মুখে রক্ত তুলে খাটতে হয়। অথচ এরাই সভ্যতার নির্মাতা। এই তিলোত্তমা নগরী, এই ঝাঁ চকচকে দালান – এরাই তৈরি করেছে। তাদের তৈরি স্কুল কলেজে তাদের ছেলেমেয়েরা পড়তে পারে না, তাদের নির্মিত হাসপাতালে তাদের চিকিৎসা হয় না। এই সভ্যতা, এই স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল, এই রাষ্ট্র তাদের নয়। যাদের টাকা আছে তাদের।

গরিব মাটিকাটা শ্রমিকদের জীবন দেখে বহুদিন আগে বেদনায় ক্ষোভে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত উপন্যাসে লিখেছিলেন, "আধুনিক সভ্যতার বাহন তোরা – তোরা মর্। কিন্তু যে নির্মম সভ্যতা তোদের এমন ধারা করিয়াছে তাহাকে তোরা কিছুতেই ক্ষমা করিস না। যদি বহিতেই হয়, ইহাকে তোরা দ্রুতবেগে রসাতলে বহিয়া নিয়া যা।" দেশে যে যখন ক্ষমতায় বসেছে সে-ই শ্রমিক অধিকার, দেশের স্বার্থ সবকিছু বিসর্জন দিয়ে দেশটাকে আপাদমস্তক লুট করে নিয়েছে। দুর্নীতিতে সবাই আকণ্ঠ নিমজ্জিত। গত ৪২ বছরের পুঁজিবাদী শাসনে যে সরকার যখন দেশ শাসন করেছে দেশটাকে শুষে তারা আখের ছোবড়ায় পরিণত করেছে। শ্রমিক হত্যা, নারী নির্যাতন, দেশের সম্পদ বিদেশিদের হাতে তুলে দেয়ার ব্যাপারে এরা সবাই এক। পার্থক্য শুধু এদের বহিরাঙ্গে। নীতিগত ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। পুঁজিপতিদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই এরা ক্ষমতায় বসে। এরা তাদেরই সেবাদাস, বৃহৎ শিল্পপতিদের পলিটিক্যাল ম্যানেজার। ম্যানেজারির সুযোগ প্রতি ৫ বছর পরপর কে পাবে – এটা নিয়েই এদের মারামারি। এই পুঁজিবাদই আজ শ্রমিকদের নিঃস্ব করেছে, তাদের পরিবারকে পথে নামিয়েছে। যতদিন পুঁজিবাদ থাকবে, তাদের পলিটিক্যাল ম্যানেজাররা দেশ শাসন করবে ততদিন এ মৃত্যুর মিছিল বন্ধ হবে না। এর কোন বিচার নেই। কারণ, দেশ আজ দুইভাগে বিভক্ত – একদিকে মুষ্টিমেয় মালিক ও ধনিকগোষ্ঠী, অন্যদিকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষ। মালিকের রাষ্ট্রে, মালিকের আইনে শ্রমিকের বিচার পাওয়ার আশা নেই। এর প্রতিকার একটাই শ্রমিকের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা।

সেদিনের ঐ ঘটনার পর হাজার হাজার সাধারণ মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছেন উদ্ধারকার্যে। একদিকে শ্রমিকের প্রতি মালিকের নিষ্ঠুরতা আর সরকারের অবহেলা, উদ্ধার কাজে গাফিলতি; অন্যদিকে মানুষের প্রতি সহজাত সহমর্মিতাবোধ থেকে সাধারণ মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে। সরকার এমনকি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও জোগান দিতে পারেনি, জনগণ নিজেরাই টর্চ-ড্রিল মেশিন-হ্যাক্সো ব্লেড-অক্সিজেন সিলিণ্ডার ইত্যাদি কিনে উদ্ধারকাজ চালিয়েছে। আহতদের চিকিৎসা এবং স্বজনের খোঁজে দূর-দূরান্ত থেকে আসা মানুষকে খাওয়াতে ব্যক্তি উদ্যোগে অর্থ সাহায্য দিয়েছেন অনেকেই। শত শত ছাত্র-যুবক, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীরা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেছেন। গণজাগরণ মঞ্চ, মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শত শত তরুণ-যুবক রক্ত দিতে ভিড় জমিয়েছেন। এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। এই তরুণেরাই সমাজ বদলের কাণ্ডারী। লাখো তরুণের 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই' ধ্বনিতে সারা দেশ প্রকম্পিত হয়েছিল, এই শ্রমিক হত্যার বিচারের দাবিতেও তারা নিশ্চয় রাজপথ কাঁপিয়ে তুলবে – তা না হলে এই শোক-সহমর্মিতার কোনো মূল্য থাকবে না।

স্বাধীনতার জন্য এদেশের লাখো মানুষ প্রাণ দিয়েছিল। তারা দেশের মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেদিন তারা কল্পনাও করেননি স্বাধীন দেশে পুঁজিপতিদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য হাজার শ্রমিককে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে। শ্রমিকের নির্বাক লাশ আজ কোটি জনতার সামনে প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছে – এই কি স্বাধীনতা? এ স্বাধীনতা মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির শোষণের স্বাধীনতা। আজ প্রকৃত স্বাধীনতার মূল্য রাখতে হলে, শ্রমিকদের এই দুঃসহ শোষণ থেকে মুক্তি দিতে হলে পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করার সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে।

গোটা জাতি আজ শোকাহত, বাকরুদ্ধ। এই শোকের মাতম সংগ্রামের প্লাবন ডেকে আনুক।

বাম মোর্চা ও বাসদের যৌথ বিক্ষোভ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

বাম মোর্চার সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কমরেড মোশরেফা শিশু, বক্তব্য রাখেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, কমরেড সাইফুল হক, মোশাররফ হোসেন নান্নু, নজরুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন হামিদুল হক, জোনায়েদ সাকী। কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, 'এই শ্রমিক-কৃষক মেহনতী মানুষের রক্তেই আমাদের দেশটি স্বাধীন হয়েছিল। সেই রক্তপাত আজও থামেনি। কি নির্মম, নিষ্ঠুর, ভয়ংকর অত্যাচার হলো সাভারে। মালিকের অবহেলায় এত এত প্রাণ ধ্বংস হয়ে গেল। পৃথিবীতে এ ধরনের ঘটনা বিরল। এটি কোনো দুর্ঘটনা ছিল না, এটি হত্যাকাণ্ড। এই ঘটনার জন্য হয়তো একজন বিশেষ মালিক দায়ী। কিন্তু এর মূল সমস্যা লুকিয়ে আছে এই ব্যবস্থায়। ব্যবস্থাটাই এখানে এমন যে, শ্রমিক শোষণ করে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা লুটপাট করা যায়। লুটপাটকারীদের দল আওয়ামী লীগ-বিএনপি'র হাজার হাজার কোটি টাকার উৎসও এই গার্মেন্টস শিল্প।

তিনি বলেন, দেশের এই ভয়ংকর বিপদ থেকে জাতিকে রক্ষা করতে হলে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। কিন্তু এ শক্তি আমার, বামপন্থীরা এককভাবে রাখি না। আমরা দেশের শিক্ষিত-সচেতন, দেশপ্রেমিক, মানবদরদী মানুষের প্রতি আহ্বান জানাই, আপনারা এগিয়ে আসুন। শ্রমিক ভাইদের বলব, আর অবহেলা সহ্য করবেন না। যতদিন সইবেন ততদিন এই ব্যবস্থা টিকে থাকবে। আপনাদের সমস্ত শক্তি, সাহস, সচেতনতা নিয়ে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করুন। জয় আমাদের হবেই।

জনজীবনের সংকট নিরসনের দাবি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিকাল ৪.৩০টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বাসদের কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ নেতা জহিরুল ইসলাম, ফখরুদ্দিন কবির আতিক, ছাত্র ফ্রন্ট নেতা কল্যাণ দত্ত। সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল পল্টন, দৈনিক বাংলা, গুলিস্তান হয়ে পুনরায় প্রেসক্লাবের সামনে এসে শেষ হয়।

সমাবেশে কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী বলেন, "দেশ আজ এক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন। একদিকে মূল্যবৃদ্ধি, লোডশেডিং, সন্ত্রাস, দুর্নীতি; অন্যদিকে ক্ষমতাকেন্দ্রিক দ্বি-দলীয় সংঘাত-হানাহানি জনজীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। যেন-তেনভাবে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার মনোভাব আগামী নির্বাচনকে ঘিরে অনিশ্চয়তা ঘনীভূত করে তুলছে। হেফাজতে ইসলামসহ ধর্মান্ধ শক্তিগুলো দেশকে মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিতে চায়। ভোটের রাজনীতির স্বার্থে সরকারী ও বিরোধী দল উভয়ই এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাথে আঁতাত করছে অথবা তাদের তোয়াজ করছে। ফলে দেশের গণতন্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ আজ হুমকির সম্মুখীন। একাত্তরের চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি ঠেকাতে মরিয়া হয়ে জামাতে ইসলামী সারাদেশে সহিংসতা ঘটাচ্ছে। প্রতিশোধস্পৃহা থেকে হামলা করা হয়েছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর।" তিনি আরো বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব নয়।

সমাবেশে বাগেরহাটের রামপালে সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের চুক্তির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়, এই তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের ফলে সুন্দরবন বিপন্ন হয়ে পড়বে। সমাবেশ থেকে ক্ষমতা দখলের দ্বি-দলীয় হানাহানির রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করে বাম-গণতান্ত্রিক বিকল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

সিলেট : ২১ এপ্রিল বিকাল ৪টায় সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে মিছিল শুরু হয়ে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট প্রদক্ষিণ করে পকন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে সমাবেশে মিলিত হয়। জেলা বাসদ আহ্বায়ক উজ্জল রায়ের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব রনেন সরকার রনির পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ নেতা এড. হুমায়ূন রশীদ সোয়েব, শ্রমিক ফ্রন্ট জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত সিনহা, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির আহবায়ক হৃদেশ মুদি, মহিলা ফোরাম জেলা সাধারণ সম্পাদক নিলু-ফার ইয়াছমিন, ছাত্র ফ্রন্ট নগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক রেজাউর রহমান রানা, ছাত্র ফ্রন্ট শাবিপ্রবি শাখার আহ্বায়ক তামান্না আহমদ।

গাইবান্ধা : ২২ এপ্রিল বাসদ গাইবান্ধা সদর উপজেলা শাখার উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদ আহবায়ক আহসানুল হাবীব সাঈদ, মনজুর আলম মিঠু, কাজী আবু রাহেন শফিউল্যা।

রংপুর : বাসদ রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে গত ১৬ এপ্রিল রংপুর নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জাহাজ কোম্পানী মোড়ে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাসদ নেতা আনোয়ার হোসেন বাবলু। সমাবেশে বক্তৃতা করেন পলাশ কান্তি নাগ, আহসানুল আরেফিন তিতু।

মে মাসের কয়েকটি পালনীয় দিবস

৮ মে : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত, মিত্রবাহিনীর হাতে জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পন (১৯৪৫)

১৭ মে : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যু (১৯১৩), মুকুন্দ দাসের মৃত্যু (১৯৩৪)

২২ মে : ভিক্টর হুগোর মৃত্যু (১৮৮৫)

২৩ মে : প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ (১৮১৮)

২৪ মে : বিজ্ঞানী কোপার্নিকাসের মৃত্যু (১৫৪৩)

২৭ মে : অক্ষয়কুমার দত্তের মৃত্যু (১৮৮৬)

২৮ মে : শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের মৃত্যু (১৯৭৬)

৩০ মে : ভলতেয়ারের মৃত্যু (১৭৭৮)

শ্রমিক গণহত্যার বিচার দাবি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) আহতদের চিকিৎসার পুরো ব্যয়ভার বহনসহ উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবি জানান। তাঁরা আইন মোতাবেক কর্মস্থলে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মালিকদের বাধ্য করার জন্য সরকারকে উদ্যোগ নেয়ার দাবি জানান। এর আগে ২৫ এপ্রিল সকালে শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে জহিরুল ইসলাম, প্রকৌশলী হারুন-আল-রশীদ প্রমুখ বাসদ নেতৃবৃন্দ সাভারের দুর্ঘটনাকবলিত রানা প্লাজা এলাকা ও অধরচন্দ্র স্কুল পরিদর্শন করেন এবং প্রত্যক্ষদর্শী শ্রমিকদের সাথে কথা বলেন।

কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী বলেন, ভবনটিতে গতকাল ফাটল দেখা দেয়ার পরও যে ভবন মালিক ও গার্মেন্টস কর্তৃপক্ষ ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে কাজ করতে শ্রমিক-কর্মচারীদের বাধ্য করেছে, তারাই শ্রমিকদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। একই সাথে ত্রুটিপূর্ণ ভবন নির্মাণ ও অনুমোদন প্রদানের সাথে যারা জড়িত সেই ভবন মালিক, সরকারি কর্মকর্তা-প্রকৌশলী, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কেউই এ ঘটনার দায় এড়াতে পারে না। দুর্ঘটনার আগের দিন ফাটল ধরার পরও সাভারের ইউএনও ভবনটি সীল না করে চালু রাখার অনুমোদন দিয়েছেন। ফলে এ হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী সকলকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে।

তিনি আরো বলেন, একের পর এক অগ্নিকাণ্ড-দুর্ঘটনা-ভবন ধসে শ্রমিকের মৃত্যু হলেও সরকার নির্বিকার। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-বিল্ডিং কোড-কারখানা আইন কোনো কিছুরই বাস্তবায়ন নেই, দোষীদের শাস্তি নেই। অতীতের ঘটনাগুলো ধামাচাপা দেয়ার ফলেই প্রতিকারহীনভাবে মালিকের মুনাফার লালসায় বলি হচ্ছে শ্রমিকেরা। ফলে এর দায় সরকারও কোনোভাবে এড়াতে পারবে না। তিনি সাভারে দুর্ঘটনা ও বিপুল প্রাণহানির কারণ সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের নিন্দা জানান।

কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী এই ধরনের নির্মম গণহত্যার পুনরাবৃত্তি রোধে ব্যবস্থা গ্রহণে মালিকগোষ্ঠী ও সরকারকে বাধ্য করতে ধারাবাহিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য শ্রমিকশ্রেণী, জনসাধারণ, শ্রমিক সংগঠন ও বামপন্থী দলসমূহের প্রতি আহ্বান জানান।

ঢাকার পল্লবীতে বাসদের বিক্ষোভ

নোয়াখালীতে মানববন্ধন

ছাত্র ফ্রন্ট : কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ২৪ এপ্রিল সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বগুড়া : জেলা বাসদের উদ্যোগে গত ২৪ এপ্রিল বিকেলে সাতরাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

চাঁদপুর : জেলা বাসদের উদ্যোগে ২৫ এপ্রিল শহরের কালীবাড়ী শাপলা চত্বরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

নওগাঁ : গত ২৫ এপ্রিল নওগাঁ জেলা বাসদের পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৫টায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার-এর পাদদেশের সমাবেশে নওগাঁ জেলা বাসদের সংগঠক হবিবর রহমান চৌধুরী সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ম.আ.ব সিদ্দিকী বাদাম, মতিউর রহমান মিঠু, ইশতিয়াক আহম্মেদ, শুভন প্রমুখ। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মুক্তির মোড়ে শেষ হয়।

সিলেট : বাসদ সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে ২৫ এপ্রিল বিকেলে শহরে বিক্ষোভ মিছিল এবং নগর ভবনের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

রংপুর : গত ২৪ এপ্রিল বাসদ রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল শেষে জাহাজ কোম্পানী মোড়ে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদ আহবায়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, পলাশ কান্তি নাগ, ছাত্র ফ্রন্টের জেলা সভাপতি আহসানুল আরেফিন তিতু। একই দাবিতে গত ২৮ এপ্রিল বেলা ১১টায় বাসদ রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

নোয়াখালী : গত ২৬ এপ্রিল সকালে নোয়াখালীতে বাসদ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে। সকাল সাড়ে ১০টায় মাইজদী টাউন হল মোড়ে ঘণ্টাব্যাপী এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। পরে বেলা সাড়ে ১১টার সময় মানববন্ধন-সমাবেশ শেষে জেলা শহরের প্রধান প্রধান সড়কে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মানববন্ধন-সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাসদ জেলা আহ্বায়ক মতিন উদ্দিন আহমেদ। বক্তব্য রাখেন জেলা সদস্য সচিব দলিলের রহমান দুলাল, সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা তারকেশ্বর দেবনাথ নান্টু, তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির জেলা আহ্বায়ক আনম জাহের উদ্দিন, ফখরুল ইসলাম, মাসুদ রেজা, ছাত্র ফ্রন্টের জেলা আহ্বায়ক বিটুল তালুকদার প্রমুখ।

হাজী দানেশ বিশ্ববিদ্যালয় : সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পক্ষ থেকে ২৯ এপ্রিল সকালে বিক্ষোভ মিছিলসহ ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে ডি-বক্স চত্বরে এসে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্ট বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সংগঠক আরজুনা বেগম, সাধন চন্দ্র বর্মন, সংগঠনের দিনাজপুর জেলা সাধারণ সম্পাদক এ.এস.এম. মনিরুজ্জামান।

মহিলা ফোরাম : সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে সাভারে শ্রমিক হত্যার বিচার ও দায়ী ভবন ও গামেন্টস মালিকসহ দোষীদের শাস্তি প্রদান, নিহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও আহতদের চিকিৎসাসহ উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে এবং হেফাজত ইসলামের নারী-বিদ্বেষী অগণতান্ত্রিক ১৩ দফা রুখে দাঁড়ানোর আহ্বানে ২৬ এপ্রিল বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এড. সুলতানা আক্তার রুবি, বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক মর্জিনা খাতুন, দপ্তর সম্পাদক তাসলিমা নাজনীন সুরভী, সদস্য আফসানা বেগম লুনা।

মে দিবস পালিত

(শেষ পৃষ্ঠার পর) এড. শীতল চন্দ্র ঘোষ, জয়নাল আবেদীন, জি এম বাদশা, আজিজুর রহমান ও বিধু ভূষন নাথ পলাশ।

সিলেট : ১ মে বিকাল ৩টায় বাসদ সিলেট জেলার উদ্যোগে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি স্থানীয় সারদা হল থেকে শুরু হয়ে চৌহাট্টা পয়েন্টে এসে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা আহ্বায়ক কমরেড উজ্জ্বল রায় এবং পরিচালনা করেন সদস্য সচিব রনেন সরকার রনি। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ সিলেট জেলা নেতা এড. হুমায়ূন রশীদ সোয়েব, শ্রমিক ফ্রন্ট সিলেট জেলা সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত সিনহা, বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক হৃদেশ মুদি, চা-শ্রমিক ফেডারেশন সিলেট জেলা আহবায়ক বীরেন সিং, মহিলা ফোরাম জেলা সাধারণ সম্পাদক নিলুফার ইয়াছমিন, ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর সভাপতি ডা. জয়দীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

মহিলা ফোরাম : সাভারে শ্রমিক হত্যার বিচার ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে মহান মে দিবসে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম চট্টগ্রাম জেলা শাখার উদ্যোগে নিউ মার্কেট চত্বরে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি পপি চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জান্নাতুল ফেরদাউস পপি, নাসিমা আক্তার ও পূরবী চক্রবর্তী।

গাজীপুর : জেলা বাসদের উদ্যোগে ১ মে সকালে সদর উপজেলার কোনাবাড়ী-কাসিমপুর শিল্পাঞ্চলে মে দিবসের র‍্যালি ও কাসিমপুর বাজারে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদ নেতা মশিউর রহমান খোকন, দেলোয়ার হোসেন, শ্রমিক ফ্রন্ট নেতা শাহ জালাল। এদিন বিকেলে সদর উপজেলার সালনা হাইস্কুলে মে দিবসের আলোচনা সভা এবং সালনা বাজারে মিছিল ও কাউলতিয়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলোচনা করেন আবু নাঈম, আব্দুল হালিম, তরুণ কান্তি বর্মন, নাইস পারভীন, রিয়াদ হোসেন।

বাসদ ফ্রান্স সমর্থক ফোরাম : ফরাসি বিপ্লবের স্মৃতি বিজড়িত ফ্রান্সের ঐতিহাসিক বাস্তিল চত্বরে মহান মে দিবস উপলক্ষে ফরাসি শ্রমিক সংগঠনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) ফ্রান্স সমর্থক ফোরামের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। গত ১ মে বাস্তিল চত্বরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে বাসদ সমর্থকরা ব্যানার-ফেস্টুন হাতে যোগ দেন। সমাবেশ শেষে বাসদ ফ্রান্স সমর্থক ফোরামের পক্ষ থেকে র‍্যালি করা হয়।

চাঁদপুর

সিলেট

জয়পুরহাট

নোয়াখালী

চট্টগ্রাম

শোধনবাদ-সংস্কারবাদ-আপসকামীতার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম গড়ে তুলুন

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর) কেউ শুনেছেন, নেতাদের সম্পর্কে উল্টো-পাল্টা সমালোচনা করছি? কখনোই এসব করিনি। ফলে কমরেডস, বুঝতেই পারছেন, যখন দলের আদর্শগত ভিত্তিকেই আঘাত করা হল, তখন সংগ্রামটা আর প্রচলিত রীতি-নীতি-পদ্ধতির অধীনে চলে না। এটা একটা সর্বাত্মক-সর্বব্যাপক সংগ্রামে রূপ নেয়। এর মানে হল, যখন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আক্রান্ত হয়, তখন মার্কসবাদী বলে দাবিদার কোনো ব্যক্তি নিশ্চুপ থাকতে পারে না। আমরা সেভাবেই চেষ্টা করেছি। যেনতেন প্রকারে জড়াজড়ি করে থাকা বিপ্লবী রাজনীতি নয়, বিপ্লবী রাজনীতির শক্তিবৃদ্ধি এভাবে হয়ও না। সঠিক মতাদর্শের ভিত্তিতে সঠিক পথে সংগ্রাম চালিয়েই যথার্থ পার্টি গড়ে ওঠে, পার্টির শক্তিবৃদ্ধি হয়। এ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আজ এখানে এত কমরেড সমবেত হয়েছেন। এদেশের বিপ্লবী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ এখানেই রচিত হবে।

কমরেডস, এখন আমাদের দলের অভ্যন্তরে আদর্শগত সংগ্রাম, সাংস্কৃতিক সংগ্রামকে প্রধান করে সাংগঠনিক বিন্যাস ঘটাতে হবে। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে মার্কসবাদের ভিত্তিতে সংগ্রাম করার যে শিক্ষা কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের সামনে রেখে গেছেন, তার পরিপূর্ণ চর্চা করতে হবে। এ সংগ্রামের ভিতর দিয়ে এমন একদল নেতাকর্মী গড়ে তুলতে হবে যারা দলের সঙ্গে, বিপ্লবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হওয়ার সংগ্রামে নিজেদের উৎসর্গ করবে। যৌথজীবন সংগ্রামের নীতিমালার ভিত্তিতে জীবনযাপন, আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, যুক্তি করার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। কমরেডদের রাজনৈতিক চেতনার মান, পড়াশোনার মান উন্নত করে তুলতে হবে। একই সাথে গণআন্দোলন-গণসংগ্রাম গড়ে তোলার কাজে কমরেডদের নিয়োজিত করতে হবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার হাতিয়ারে সমৃদ্ধ হয়ে এদেশের মাটিতে আমরা একটি সত্যিকারের সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি গড়ে তুলতে সক্ষম হব। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে শোধনবাদ-সংস্কারবাদ-আপসকামীতার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম গড়ে তুলুন - কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

[গত ১১-১২ এপ্রিল '১৩ জাতীয় প্রেসক্লাবের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি সভায় এবং এরপর ১৯ এপ্রিল চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক কর্মীসভায় কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী জাসদের অভ্যন্তরে মতাদর্শিক সংগ্রাম এবং বাসদ গড়ে ওঠার পটভূমি, বাসদের অভ্যন্তরে গত ৩২ বছর ধরে চলা সংগ্রাম এবং সর্বশেষ গত আগস্ট '১২-এর কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির থেকে শুরু হওয়া মতাদর্শিক বিতর্কের ইতিহাস তুলে ধরেন। ওই সকল সভায় কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর বক্তব্যের কিছু অংশ এখানে সম্পাদিত আকারে প্রকাশ করা হল।]

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পর শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে মানুষের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যখন মার খেতে শুরু করল, তার বিরুদ্ধে ছাত্র-যুবক-তরুণদের প্রবল প্রতিবাদের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে জাসদ গড়ে উঠেছিল। এই ছাত্র-যুবক-তরুণেরা শাসকদের লুটপাটের সঙ্গে যুক্ত হতে চায় নি। জাসদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের শ্লোগান আসলে একটা আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করেছিল। কিন্তু কেমন করে সমাজতন্ত্র হয়, কেমন করে বিপ্লবের উপযোগী পার্টি হয়, এসব কিছুই তাদের সামনে পরিষ্কার ছিল না। এ-সম্পর্কে জাসদ নেতাদের মধ্যে স্বচ্ছ-স্পষ্ট কোনো ধারণাও ছিল না। আমার মাধ্যমে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সাথে পরিচিত হয়ে তারা একটা প্রয়োজনের হাতিয়ার খুঁজে পেলেন, যা দিয়ে ছাত্র-যুবক-তরুণদের আকৃষ্ট করা যায়, ধরে রাখা যায়। এটা তাদের প্রয়োজনবাদীতার ঝোঁক, উপস্থিত প্রয়োজনের তাগিদ। কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী চিন্তাকে ধারণ করে নিজেদের জীবন পাল্টানোর প্রশ্ন যখন এল, তখন কিন্তু এঁরা আর তা করতে পারলেন না, এ তাঁদের সাধ্যের মধ্যেই ছিল না। তার মানে কিন্তু এই নয় যে জাসদ নেতারা সব ব্যক্তিগতভাবে অসৎ ছিলেন। তাঁরা বুর্জোয়া মানবতাবাদী চিন্তার কাঠামোর মধ্যেই আটকে ছিলেন। সেখান থেকে নিজেদের ভেঙেচুরে সর্বহারাশ্রেণীর আদর্শে নতুনভাবে গড়ে তোলার কাজটি করতে পারলেন না। এদিক থেকে জাসদ ব্যর্থ হয়ে গেছে, কিন্তু জাসদ একদল মানুষ দিয়ে গেছে যাদের নিয়ে আমরা বাসদ শুরু করেছিলাম। এ-অর্থে জাসদ একটা অবদান রেখেছে।

বাসদের অভ্যন্তরে আমরা দীর্ঘ ৩২ বছর যে সংগ্রাম করেছি তার সবটাই আজকের কমরেডদের সামনে স্পষ্ট নয়। এটা বাস্তব কারণেই। আমরা কি ৩২ বছর ধরে শুধু ঐক্যের ভিত্তিতে চলেছি, আর হঠাৎ আট মাস আগে সংগ্রাম শুরু করেছি? – এমন প্রশ্ন কমরেডদের মাথায় আছে। কমরেডস, আমরা সব সময় 'ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্য' নীতির ভিত্তিতে চলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কখন কি কি সংগ্রাম আমরা করেছি, তার সবটাই আমাদের সব কমরেড জানবেন, এটা কি বাস্তবসম্মত কোনো উপলব্ধি? যতক্ষণ আমরা দলের অভ্যন্তরে সংগ্রাম করেছি, ততক্ষণ তো দলের নীতি-পদ্ধতি মেনেই সংগ্রাম করেছি। কেন্দ্রীয় কমিটির অভ্যন্তরে কি কি বিষয় নিয়ে মতবিরোধ হল – সেটা কি আমরা নিচের দিকের কমরেডদের জানাতে পারি? আমাদের বুঝতে না পারার অনেক ত্রুটি-ঘাটতি থাকতে পারে, সংগ্রাম কেমন করে করব সে অভিজ্ঞতার ঘাটতি থাকতে পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা ৩২ বছর ধরে সংগ্রাম বর্জিত ঐক্যের মধ্যে ছিলাম।

জাসদ থেকে বেরিয়ে আমরা যখন বাসদ শুরু করলাম, তার অল্প দিনের মধ্যেই 'জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে দল গড়ে তোলার সংগ্রাম', 'যৌথজীবন' ইত্যাদি নিয়ে একদল নেতা মতবিরোধ শুরু করলেন। এরা বলা শুরু করলেন, এক সাথে এক ঘরে থাকা, এটা তো স্বাস্থ্যকর নয়, বাস্তবসম্মতও নয়। কেউ কেউ বললেন, এক ঘরে থাকতে শুরু করলে তো আমার শ্বাসকষ্ট হবে, ইত্যাদি নানা ধরনের কুযুক্তি এরা সামনে আনলেন। আমরা সেদিন বলেছিলাম, একসাথে একঘরে থাকা তো আমাদের এ মুহূর্তের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। আমরা যতখানি দলের সম্পদ সংগ্রহ করতে পারব, আমাদের থাকার আয়োজনও সে-অনুযায়ী হবে। তারা সেদিন তত্ত্ব অনুযায়ী জীবন পরিবর্তনের পথে গেলেন না। দলের সবচেয়ে নামকরা, ক্ষমতাবান নেতারাই দল ছেড়ে চলে গেলেন।

কমরেডস, একটা কথা আপনাদের বুঝতে হবে। যৌথজীবনের কথাটা কেন এসেছে? কমরেডরা আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে কাজ করবেন, তারপর ফিরে এসে নিজেদের কাজের রিপোর্ট করবেন, এই করলাম, এই কথা বললাম, এই যুক্তি করলাম। এভাবে যখন পরস্পর পরস্পরের কাছে নিজের কাজের জবাবদিহি করবেন, তার মধ্য দিয়েই একদিকে বোঝা যাবে কেমন করে তিনি সর্বক্ষণ দলের চিন্তায়, বিপ্লবের চিন্তায় বিভোর ছিলেন, আবার এটাও বোঝা যাবে, তিনি মানুষের সাথে যে কথাগুলো বললেন, যে যুক্তিগুলো করলেন সেটা ঠিক করলেন না ভুল করলেন। এভাবে নিজেদের পরীক্ষা দিয়ে, নিজেদের খণ্ডিত অভিজ্ঞতাগুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা-তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে একটা সামগ্রিক অভিজ্ঞতা দাঁড় করাবেন।

বাসদের অভ্যন্তরে নেতাদের মধ্যে গভীর ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা-ভক্তির সম্পর্ক ছিল। তখন এমন সময়ও গেছে যে এঁরা মনে করতেন, যেহেতু আমি কমরেড শিবদাস ঘোষের মতো একজন বড় বিপ্লবীর সাহচর্যে বেড়ে উঠেছি, ফলে কমরেডদের চরিত্র গড়ে তোলার জন্য আমি ভূমিকা রাখতে পারি।

শুরুর দিকে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতাম, নেতারা চুপ করে শুনতেন। কোনো বিরোধ করতেন না। কিন্তু এটা কি সম্ভব যে আমি সবই ঠিক কথা বলেছি? সে-সময় আমার সাথে সম্পর্কের ধরনের মধ্যে পুরনো দিনের বুর্জোয়া মানবতাবাদী ধরনের একটা সম্পর্ক ছিল, কোনো ডায়ালেকটিক্যাল সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টাই করেননি। আবার পরের দিকে আমার দু'চারটা কথার বিরোধ করতেন, বলতেন যে এটা ঠিক নয়, কিন্তু কেন ঠিক নয় তা নিয়ে কোনো তর্ক-বিতর্ক করতেন না। আমাকে তর্কে পরাজিত করে, আমার মতটাকে ভুল প্রমাণ করে দিলে তবেই তো আমি বুঝব, অন্য কমরেডরাও বুঝবেন যে আমার চিন্তা ভুল আর ওনাদের চিন্তা ঠিক। কিন্তু সেসব কিছু করতেন না। প্রায়শই মন্তব্য দিয়ে শেষ হয়ে যেত।

আমাদের বিপ্লবী রাজনীতির মধ্যে দেশপ্রেমের আবেগ, জাতীয়তাবাদী গর্ব ইত্যাদি কাজ করে। দেশপ্রেমের সঙ্গে সম্পর্কিত যে নানা আবেগ, আবেগের গড়ন (প্যাটার্ন), একটা মননশীলতা গড়ে ওঠে সেক্ষেত্রে কমরেডদের মধ্যে ভিন্নতা আছে। এটা থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। মানুষের মধ্যে এই আবেগের প্যাটার্নের ভিন্নতা থাকে বলেই একই গান একেক শিল্পী একেক ভঙ্গিতে গায়। বিপ্লবী রাজনীতিতে সুরের অভিন্নতা গড়ে তুলতে হয়, আবেগকে বিপ্লবী রাজনীতির পরিপূরক করে প্যাটার্ন করতে হয়। তাই এটা নিয়ে ঐক্যের মধ্যেই সংঘর্ষে যেতে হয়। নতুন উপলব্ধি তৈরি করতে হয়। আমার যতটুকু আবেগ সেটা কমরেড শিবদাস ঘোষকে নিয়ে, কমরেডদের নিয়ে। কিন্তু এঁরা বলতেন যে আপনি বেশি বেশি আবেগ দেখান। অত্যন্ত সাধারণ ফর্মে এ কথাটা বলতেন। কিন্তু কোন্ দিক থেকে আমার আবেগ ভুল, কেন ভুল, সেসব নিয়ে কখনো তর্ক-বিতর্ক করেননি। সে-সময় বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পারছি, এগুলো হল শিবদাস ঘোষকে অস্বীকার করার, ডিনাই করার প্রবণতা। আজকে যেটা উন্মোচিত হল তার ভিত্তি এভাবে ধীরে ধীরে রচিত হয়েছে।

আমাদের দলের নেতারা তো বুর্জোয়া মানবতাবাদী চিন্তার কাঠামো থেকেই এসেছেন। নিজেদের ইগোকে, অহমকে দলের স্বার্থে, বিপ্লবের স্বার্থে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার সংগ্রাম এক কঠিন-কঠোর নিরন্তর সংগ্রাম। নিজেকে সম্পূর্ণ ভেঙেচুরে গড়ার সংগ্রাম না করলে ব্যক্তির অহম, যেটা খুব সূক্ষ্মভাবে কাজ করতে থাকে, তার থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। আমাদের দলের তরুণ-যুবক কমরেডরা আমার সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলে তারা আহত হতেন। আমি আবেগে কমরেড শিবদাস ঘোষকে যতখানি ধারণ করি, বিশ্বাসে যতখানি ধারণ করি, তারই খানিকটা প্রভাব পড়ায় তরুণ কমরেডরা আকৃষ্ট হয়। আমি কমরেড শিবদাস ঘোষকে যথার্থ উচ্চতায় তুলে ধরলে নেতারা তা পছন্দ করতেন না এবং নিষ্প্রভ বোধ করতেন।

এই ইগোর কি বিষময় প্রভাব আমাদের দলে ছিল সেটা বহু কমরেড প্রত্যক্ষ করেছেন। যেই কোনো নেতার সঙ্গে, অপারেটিভ নেতার সঙ্গে কোনো একজন কর্মীর বিরোধ হল, অমনি তার রাজনীতি করা দুর্বিসহ হয়ে উঠল। তাকে আর তিষ্ঠাতেই দিল না। কেউ তর্ক করলেই দেখা গেছে তাকে ভর্ৎসনা করে একেবারে চুপসে দেয়া হয়েছে। এমন বহু বার হয়েছে। নিজেদের অস্থিরতার জন্য কমরেডদের ভাগিয়ে দেয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। বিরোধ করেছি, কিন্তু ঠেকাতে পারিনি। বহু কমরেড, সম্ভাবনাময় কমরেডকে আমরা হারিয়েছি।

এখন কেউ কেউ প্রশ্ন করছেন, ওই সময় কেন দাঁড়ান নি, কমরেডদের রক্ষা করেননি, বিরোধ করেননি? কমরেডদের রক্ষা করতে চেষ্টা করিনি, এ কথাটা সম্পূর্ণ ভুল। কিন্তু যেহেতু মৌলিক কোনো বিরোধ আসেনি, তাই সেটা সবার জানার কথাও নয়, সেটা নিয়ে আমরা সর্বাত্মক বিরোধে যাই-ও নি। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, কিছু কমরেড যারা চলে গেলেন, তারা কিছু কথা বলে দল থেকে চলে গেলেন। কি কথা তারা বলেছিলেন? এর মধ্যে কতটুকু রাজনীতি ছিল? ব্যক্তিগত ক্ষোভ কতটুকু? কি তাদের যুক্তি? কি তাদের সংস্কৃতি? তারা দলের ভেতরে দাঁড়িয়ে তো লড়াইটা করলেন না। তারা দলের মূল আদর্শগত প্রশ্নটিকে নিয়ে কোনো যুক্তি কি তুলে ধরে বলতে পেরেছিলেন যে এজায়গায় দল বিপন্ন? এসব কিছুই তারা করেননি।

কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা তো দলের অভ্যন্তরে সব সময় আমাদের পথ দেখিয়েছে। আমার কোনো একটা ভুলের জন্য তো তাঁকে অস্বীকার করা উচিত নয়। আমরা যখন সংগ্রাম করছি তখন উনি প্রয়াত। কমরেড খালেকুজ্জামানই এক সময় বলতেন, এই পার্টিটার সঙ্গে অপর সমস্ত পার্টির যে পার্থক্য হল, কেমন করে তা হল? মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তো এদেশে ছিল, আমাদের জন্মের আগে থেকেই ছিল। কিন্তু কেউ তো আমাদের মতো মার্কসবাদী বিপ্লবী রাজনীতির বিপর্যয়ের যুগে তরুণ প্রজন্মকে টানতে পারেনি, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী রাজনীতির সংকট, শোধনবাদের বিপদ কেন হল, এটা যখন আমরা তুলে ধরেছি, তরুণরা আকৃষ্ট হয়েছে। এই পার্টি এক ভিন্ন ধরনের শক্তি রিলিজ করেছে।

এ স্বীকৃতি অন্য বামপন্থী পার্টিগুলোও দিয়েছে। তারা তো আর অবাক হওয়ার কথাটা প্রচার করবে না, কিন্তু তাক লেগে গিয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল, যে এটা একটা ভিন্ন জাতের পার্টি। কিন্তু একটা দুর্বলতা তারা ধরতে পেরেছিল। এসব পার্টির নেতাদের মধ্যে অনেকে, দলের সঙ্গে যুক্ত অনেক লেখক-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী আবার এটা ধরতে পারতেন যে, আমাদের পার্টির কয়েকজন নেতার বলার ক্ষমতা বেশ ভালো। কিন্তু বাস্তবে খুব বেশি ইন্টেলেকচুয়াল কর্মী তৈরি করতে পারছে না। এ সমস্যাটা আমাদের ছিল।

আমাদের আরো একটা বড় সমস্যা ছিল। সেটা হল গণআন্দোলন গড়ে তোলা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি। জনজীবনের মৌলিক সমস্যাগুলোকে ধরে নিরন্তর-নিরলস-নিরবচ্ছিন্নভাবে লেগে-পড়ে থেকে জনগণকে সংগঠিত করা, সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলা, আন্দোলনের প্রশ্নে জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা, গণআন্দোলন থেকে ক্রমাগত শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তি রচনা করা, নেতা-কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলা – এর কিছুই আমরা করতে পারলাম না। গত ৩২ বছরে খুবই অল্প, এক-দুবার আমরা খানিকটা চেষ্টা করেছিলাম। আর পুরোটা সময়ই আমরা আসলে কোনো একটা উপস্থিত সমস্যা নিয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানানো, একটা-দু'টা মিছিল-মিটিং-হরতাল ইত্যাদি করেই শেষ। এর ফলে দুটো ক্ষতি হল। বুর্জোয়ারা তাদের শাসনক্ষমতার সংকটে যে জনসাধারণকে বার বার ফাঁসিয়ে দেয়, এদের নিজেদের রাজনৈতিক সংকটকে জাতীয় সংকট বলে তার আড়ালে জনগণের সংকটগুলোকে চাপা দিয়ে দেয় – সেখান থেকে আমরা জনগণকে মুক্ত করতে পারলাম না। উল্টো বুর্জোয়াদের অস্থিরতার দ্বারা আমরাও প্রভাবিত (এফেক্টেড) হয়ে যেতে থাকলাম। এ সমাজের সকল সংকটের মূল ভিত্তি হল পুঁজিবাদী শাসন-শোষণের ফলে সৃষ্ট জনজীবনের সংকট। ফলে জনজীবনের সংকট নিয়ে লাগাতার গণআন্দোলন গড়ে তোলার কাজটিই হল ভিত্তি। শাসনক্ষমতার সংকটকে একটা বিপ্লবী পার্টি বিনা প্রশ্নে ছেড়ে দিতে পারে না। কিন্তু এটা সেকেন্ডারি।

গণআন্দোলনকে এভাবে বুঝতে না পারার ফলে আমরা বিপ্লবী তত্ত্ব নির্মাণের কাজটিও করতে পারলাম না। বিপ্লবী তত্ত্ব কিভাবে নির্মিত হয়? গণআন্দোলন-শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে তোলার কাজে নেতা-কর্মীরা যুক্ত হলে তারা বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তাদের সামনে সমাজজীবনের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হয়, নতুন নতুন সংকট, প্রশ্ন তাদের সামনে উপস্থিত হয়। তখন সেগুলোকে নিয়ে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করে দলের যৌথজ্ঞান নির্মাণের প্রক্রিয়ায় দেশের রাজনীতিক-সাংস্কৃতিক-সামাজিক প্রতিটি বিষয়ের সংকটগুলোর উত্তর খোঁজা হয়। এভাবেই বিপ্লবী তত্ত্ব নির্মিত হয়। যথার্থ পন্থায় গণআন্দোলন, গণসংগ্রাম, শ্রেণীসংগ্রাম না করে একজন দু'জন বুদ্ধিমান নেতার মাথা থেকে বিপ্লবী তত্ত্ব বেরোতে পারে না।

এই গণআন্দোলন না করতে পারার ফলে আমরা ঐক্যবদ্ধ বাম আন্দোলনও গড়ে তুলতে পারলাম না। একটা বিপ্লবী দলের শক্তি যেটুকুই থাকুক, সেটা নিয়ে যখন জনগণের কোনো ইস্যু, জনজীবনের মৌলিক সংকটগুলো নিয়ে লাগাতার চেষ্টা করে, তার ভিতর দিয়েই সমাজে একটা আন্দোলনের স্রোত বা প্রবাহ তৈরি হয়। আন্দোলনের এই প্রবাহ, আন্দোলনের প্রতি জনগণের আকাঙ্ক্ষাই অপরাপর বাম প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে আসতে বাধ্য করে। এভাবেই কার্যকর বাম ঐক্য, যুক্ত আন্দোলন গড়ে ওঠে। আর তা না হলে একেক বার একেক ধরনের প্রয়োজন থেকে একেকটা শক্তি আসে, প্রত্যেকেরই তো নিজস্ব কিছু প্রয়োজন আছে, তারপর আবার চলেও যায়। যে-পর্যন্ত না জনগণের সংকট থেকে উদ্ভূত প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দিয়ে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার থেকে বাম ঐক্য গড়ে উঠবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা কোনো কার্যকর ঐক্য হবে না।

এভাবে একের পর এক কর্মনীতিতে ছোট ছোট ভুল-ভ্রান্তি, বিচারধারার ছোটখাট বিচ্যুতির পথ বেয়েই আজকের শোধনবাদী সংস্কারবাদী, আপসকামী ধারার দিকে দলের অপারেটিভ নেতৃত্ব এগিয়ে গেছেন। কমরেড লেনিন সংশোধনবাদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে বলেছিলেন, "সংশোধনবাদের অর্থনৈতিক প্রবণতার এক স্বাভাবিক পরিপূরক হলো সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্যের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি। 'আন্দোলনই সব, চূড়ান্ত লক্ষ্য কিছু নয়' – বের্নস্তাইনের এই প্রচলিত বুলি বহু দীর্ঘ যুক্তিতর্কের চেয়ে সংশোধনবাদের সারবস্তুকে ভালোভাবেই তুলে ধরছে। এক এক ঘটনায় একেক রূপ আচরণ নির্ধারণ, দৈনন্দিন ঘটনাবলী আর ছোটখাট রাজনীতির টুকরো টুকরো পরিবর্তনের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়া, সর্বহারাশ্রেণীর মৌলিক স্বার্থ এবং গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার, সমস্ত পুঁজিবাদী বিবর্তনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলীকে ভুলে যাওয়া, ক্ষণিকের প্রকৃত কিংবা অনুমিত আশু সুবিধার জন্যে এসব মৌলিক স্বার্থকে বিসর্জন দেয়া – এগুলোই হচ্ছে সংশোধনবাদের কর্মনীতি।" (মার্কসবাদ ও সংশোধনবাদ) লেনিন এখানে আরো দেখান যে শুরুতে সংশোধনবাদ দেখা দেয় ক্ষুদ্র আকারে, সামান্য সামান্য বিষয়ে। পরবর্তীকালে কমরেড শিবদাস ঘোষ সংশোধনবাদের উৎসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, এর উৎস হচ্ছে দলের কর্মীদের, সাম্যবাদী আন্দোলনের কর্মীদের চেতনার এবং সংস্কৃতির নিম্নমান।

অনেক কমরেড বলছেন, এগুলো আগে কেন বলেন নি? আগে যা বলেছি, তা কতজন বুঝতে পেরেছিলেন? যেমন, আমি আমাদের মেয়ে কমরেডদের চাকুরি করে দল করার বিষয়টা একটু বলি। আমি বলেছিলাম, আমাদের যে মেয়েরা দলের নির্দেশে চাকুরি করে তাদেরকে সার্বক্ষণিক কর্মী হিসাবে দেখতে হবে। কমরেড খালেকুজ্জামান অন্য কথা বলতেন। কখনো তর্ক করার, প্রশ্ন করার, ডিসকাশন করার পরিবেশ গড়ে তুলতে পারলাম না। ফলে আমি একটা কিছু বলে দিলেই সঙ্গে সঙ্গে সবাই বুঝে যেত? এখন তো বিষয়টা ঘটনাক্রমে সামনে চলে এসেছে। এখন যে বলছি, এখনই কি সবাই বুঝতে পেরেছে? এবার তো দলের মূল আদর্শ বিপন্ন দেখে আমি দাঁড়ালাম। কারো প্রত্যাশায় তো আমি দাঁড়াইনি। কখনো কি *(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

শিবদাস ঘোষের অবদান

মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

কমরেড লেনিন যেমন ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম, ডিক্টেটরশীপ অফ দি প্রলেতারিয়েত, প্রলেতারিয়ান পার্টি – এগুলি সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলসের বক্তব্যগুলো খানিকটা বীজের আকারে ছিল, ইলাবরেটেড ডিসকাসন ছিল না। কারণ তখন একটা বিপ্লবী দল গঠন করে বিপ্লব করার স্ট্রাগল পিরিয়ড ছিল না। সেটা ছিল সূচনাপর্ব। পার্টি গঠন করতে গিয়ে তিনি, কীভাবে একটা বিপ্লবী দল গঠন করতে হয়, ... আইডিয়ার উপর জোর দিয়েছিলেন, ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম এটাকে আরও পরিষ্কার একটা স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে এসেছিলেন। এবং সেটা সেন্ট্রালিজম এবং প্রলেটারিয়ান ডেমোক্রেসির ফিউশন, এইগুলি তিনি উত্থাপন করেছিলেন। তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুরুত্ব কতটা, অথরিটির যে জায়গাটা- এগুলি তিনি আলোচনা করেছিলেন। লেনিন পরবর্তীকালে শিবদাস ঘোষ পার্টি গঠন প্রশ্নে লেনিনের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো অনেক ইলাবরেট ও এনরিচ করেছেন। এটা করবার ক্ষেত্রে তাঁর একটা দিক ছিল, সোভিয়েত পার্টি, চাইনিজ পার্টি, ওয়ার্ল্ড কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভিন্ন দেশের পার্টির গঠন, পার্টির স্ট্রাগল, তার থেকে এক্সপেরিয়েন্স গ্যাদার করা; আর একটা হচ্ছে, সোভিয়েত পার্টি যখন গড়ে উঠছে, তখনও বুর্জোয়া মানবতাবাদ একজসটেড হয়নি। রাশিয়ার তখনকার পরিস্থিতিতে, যেহেতু রাশিয়ার পুঁজিবাদ অনুন্নত ছিল, সেখানে অন্যান্য পশ্চিমী দেশগুলির তুলনায় মানবতাবাদের ভূমিকা ... ছিল। এই ব্যাকগ্রাউন্ডে তাদের পার্টি গঠন করতে হয়েছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ যখন পার্টি গঠন করছেন, ইন্টারন্যাশনালিও মানবতাবাদ একজসটেড, ডিগ্রেডেড এবং বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদেরও যে আপেক্ষিক প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল, তা চূড়ান্ত ব্যক্তি কেন্দ্রিকতায় পর্যবসিত, কোনো সোস্যাল অবলিগেশন তার থাকছে না, ইনডিফারেন্ট অ্যাটিচিউড টু দি সোসাইটি ডেভেলাপ করছে। এই একটা দিক।

ঐ সময়ে শিবদাস ঘোষ যখন পার্টি গঠন করছেন, একটা এই সব দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া; আর একটা হচ্ছে, ইন্টারন্যাশনালি পুঁজিবাদ আরও সমস্যা জর্জরিত, লেনিনের সময়ে বুর্জোয়া মানবতাবাদের ক্ষয়িষ্ণু হলেও যতটুকু প্রগতিশীল ভূমিকা আপেক্ষিক অর্থেও ছিল, সেটা নিঃশেষিত এবং চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল আকার ধারণ করেছে। বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ, যে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের ভিত্তিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল, সমাজে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম হয়েছিল, সেই বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ যখন ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করছে, ইনডিফারেন্ট অ্যাটিচিউড ডেভেলাপ করাচ্ছে। ইন্টারন্যাশনালি, ভারতের ক্ষেত্রেও তা, ইন কম্পারিজন টু রাশিয়া ভারতের পুঁজিবাদ তদানীন্তন সময়ে উন্নত ছিল, এই ফিচারটা তিনি এখানে দেখেছিলেন। সূচনাপর্বেই তিনি ব্যক্তিবাদের ডেনজারটা বুঝতে পেরেছিলেন। যেটা লেনিন ফেস করেননি, স্ট্যালিন ফেস করেননি, মাও সে তুং কেও ফেস করতে হয়নি – তিনি ফেস করেছিলেন। সেই জন্য তাঁর মানবতাবাদী মূল্যবোধ থেকে সর্বহারা মূল্যবোধ যে সম্পূর্ণ আলাদা, বিপ্লবের স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তির স্বার্থ গৌণ, এখানে স্ট্যালিনের যে কনসেপ্ট, মার্জার, তাকে তিনি ব্যাখ্যা করছেন – পার্সোনাল ইন্টারেস্টকে সাবঅর্ডিনেট করতে হবে, পার্টি ইন্টারেস্টের কাছে। পার্সোনাল ইন্টারেস্ট একটা আছে, তাকে সাবঅর্ডিনেট করতে হবে। এখান থেকে কালিনিনের পুস্তক, লিউ শাউ চির পুস্তক, এই কনসেপ্টই চলেছে ... টোটাল এই আউটলুকটাকে ভিত্তি করেই পার্টি গঠন পদ্ধতির ক্ষেত্রে একদিকে যেমন তিনি কমিউনিস্ট মরালিটি বলতে কী বোঝায় এ যুগে, পুরনো মরালিটি কনসেপ্টে চলবে না, পুরনো কমিউনিস্ট মরালিটি মূলত হিউম্যানিজমের ভ্যালুজের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেটা আজকে আর চলতে পারে না, একটা অত্যন্ত নতুন অবদান এটাকে বলতে হবে, তিনি উত্থাপন করেছিলেন।

পার্টি গঠনের প্রশ্নে লেনিনের শিক্ষাকেও তিনি অনেকটা উন্নত করে দিয়ে গেছেন। লেনিন বলেছেন, উইদাউট এ রেভোলিউশনারি থিয়োরি... কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন, লেনিন এই থিয়োরি বলতে বুঝিয়েছেন, লেনিন বোঝাতে চেয়েছেন যে কথাটা, এটা কমরেড ঘোষের মডেস্ট এক্সপ্রেশন, তা হল, কভারিং অল অ্যাসপেক্টস অফ লাইফ, একটা এপিস্টোমোলজিক্যাল ক্যাটিগরি। লেনিন বোঝাতে চেয়েছেন বলে আসলে তিনি লেনিনের চিন্তাকে উন্নত করলেন। আবার কেউ বলতে পারেন, লেনিনকে যান্ত্রিক ভাবে বুঝলে, যেরকম অনেকে বুঝেছে, পার্টি থিসিস-ন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনাল থিসিস, এটাই রিভোলিউশনারি থিয়োরি, অন্যান্য অনেক দেশে এ রকমই বুঝেছে। লেনিনও মার্কসের চিন্তার ক্ষেত্রে বহু জায়গায় এ ভাবে উন্নত করেছেন। এটাই তো ক্রিয়েটিভ অ্যাপ্লিকেশন অফ মার্কসিজম। স্ট্যালিনও বহু লেখায় লেনিনের শিক্ষা দেখাতে গিয়ে বলেছেন, লেনিন এ কথার দ্বারা এটা বোঝাতে চেয়েছেন। লেনিনকে যখন অপব্যাখ্যা করা হচ্ছিল, তখন লেনিনের চিন্তাকে এভাব বুঝিয়েছেন স্ট্যালিন। (যেমন কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠন নিয়ে মার্টভের সঙ্গে বিতর্কে)।

লেনিন হোয়াট ইজ টু বি ডান এ বলেছেন, ইউনিটি অব আইডিয়াজ চাই। তা না হলে পার্টি হতে পারে না। খুব সুন্দর কথা। রেজোলিউশন গ্রহণ করে পার্টি হবে না। কয়েকজন বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে চাপিয়ে দিলে হবে না। ইউনিটি অব আইডিয়াজ চাই। এখানে ইউনিটি অব আইডিয়া বলতে আইডিয়া, যেটা কভারিং অল অ্যাসপেক্টস অব লাইফ গড়ে উঠেছে। এভাবেই লেনিনের শিক্ষাকে ইলাবরেট করে, এনরিচ করে কমরেড শিবদাস ঘোষ উপস্থিত করলেন। কভারিং অল অ্যাসপেক্টস অব লাইফ বিপ্লবী মতাদর্শ গ্রহণ করার মধ্যে ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইটা জড়িয়ে আছে। না হলে একটা পলিটিক্যাল প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে হয়ত ইউনিটি অব আইডিয়া হচ্ছে, কিন্তু জীবনের অন্যান্য প্রশ্নে যার যার আইডিয়া থেকে যাচ্ছে। ফলে জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে আর্দশগত কেন্দ্রিকতাকে এভাবেই আজকের দিনে বুঝতে হবে। ঐ সময় মানবতাবাদী মূল্যবোধের আপেক্ষিক প্রগতিশীলতা ছিল বলে লেনিনকে এভাবে বুঝতে হয়নি, ব্যাখ্যা করতে হয়নি। কিন্তু শিবদাস ঘোষকে করতে হয়েছে।

সর্বহারা গণতন্ত্র কীভাবে আসবে? লেনিন বলেছেন, কেন্দ্রিকতা ও সর্বহারা গণতন্ত্রের মিশ্রণ। কিন্তু কিভাবে সেটা হবে তা লেনিন বলেননি। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, আদর্শগত কেন্দ্রিকতা গড়ার মধ্য দিয়েই সর্বহারা গণতন্ত্র আসছে। সর্বহারা গণতন্ত্র আর সর্বহারা সংস্কৃতি প্রায় একই জিনিস, সিনোনিমাস। আদর্শগত কেন্দ্রিকতা হচ্ছে, দল গঠনের সঙ্গে যুক্ত যে নেতা-কর্মীরা, তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিগত চিন্তা, বুর্জোয়া চিন্তা, ভাববাদী চিন্তা ইত্যাদি নানারকম চিন্তাভাবনা যা রয়েছে তাকে মার্কসবাদের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সর্বহারা দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিণত করবার পথেই ইউনিটি অব আইডিয়া গড়ে ওঠে। ওয়ান প্রসেস অব থিংকিং এর মধ্য দিয়ে ইউনিফরমিটি অব থিংকিং এ পৌঁছানো, যা না হলে ওয়াননেস ইন অ্যাপ্রোচ আসতে পারে না। এ সবই শিবদাস ঘোষের বক্তব্য তো! ওয়ান প্রসেস অব থিংকিং আয়ত্ত করতে না পারলে ইউনিফরমিটি অব থিংকিং আসে না। এবং এটা উইথ এ সিঙ্গেলনেস অব পারপাস। এই হচ্ছে ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম। এইগুলো তো শিবদাস ঘোষের বক্তব্য। আবার এইগুলো গড়ে তুলতে হলে কনস্ট্যান্ট কমন অ্যাকটিভিটি চাই। এ দিয়েই ব্যক্তিবাদকে ফাইট করা। এইভাবে কমরেড শিবদাস ঘোষ পার্টি গঠনের ক্ষেত্রে লেনিনের তত্ত্বকে আরো উন্নত করলেন, সমৃদ্ধ করে দিয়ে গেলেন। লেনিনের তত্ত্বের মধ্যে ইনঅ্যাডিকোয়েসি ছিল বলেই তো করতে হল। অর্থাৎ বর্তমান যুগে লেনিনের ঐ তত্ত্ব দিয়ে আর চলবে না – এটা আমার কথা, শিবদাস ঘোষ এটা বলেননি। সেজন্যই পার্টির গঠনপদ্ধতির ক্ষেত্রে শিবদাস ঘোষের এই উন্নত চিন্তার প্রয়োজন। যে কোনো মার্কসীয় তত্ত্বগত বিকাশ বা উন্নতি একটা প্রয়োজনকে ভিত্তি করেই ঘটে। মার্কস থেকে শিবদাস ঘোষ পর্যন্ত প্রত্যেকেই একটা সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মার্কসীয় বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করতে গিয়ে প্রয়োজনকে ভিত্তি করেই তত্ত্বের কাঠামো দাঁড় করিয়েছেন তো! আজ পৃথিবীতে কোনো দেশে কমরেড শিবদাস ঘোষের এ চিন্তা ছাড়া এগোনো যাবে না। আর একটা পয়েন্ট। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে আসার পর লেনিন বলেছেন পুরনো অভ্যাস, সংস্কৃতি থেকে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র উৎপাদন থেকে যাচ্ছে। রাশিয়াকে ঘিরে সাম্রাজ্যবাদীদের বৃত্ত আছে। দেশের মধ্যে পরাজিত বুর্জোয়ারা রয়ে গেছে। কিন্তু বেস-এ বা অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ প্রায় অবলুপ্ত হলেও পুঁজিবাদী আক্রমণটা এল সুপারস্ট্রাকচার থেকে, সুপারস্ট্রাকচারে পুঁজিবাদ থেকে গিয়েছিল। ফলে শুধু অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্লাস স্ট্রাগল, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্লাস স্ট্রাগল, এ দিয়ে শুধু হবে না। সুপারস্ট্রাকচারে অর্থাৎ সংস্কৃতিতেও যে আলাদা একটা সংগ্রাম থাকা দরকার আছে, এই বিষয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের মত এতটা গুরুত্ব দিয়ে ইতোপূর্বে কেউ আলোচনা করেননি। ফলে বেস-এ পুঁজিবাদ প্রায় পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হওয়া সত্ত্বেও সুপারস্ট্রাকচারে পুঁজিবাদ থেকে যাওয়ার জন্যই আক্রমণটা এল রাশিয়ায়। চীনেও তাই। এইটা শিববাবু দেখিয়েছিলেন। এ হল একটা দিক।

কিন্তু সুপারস্ট্রাকচারে পুঁজিবাদ আছে, কিন্তু সে জন্য কমিউনিস্ট পার্টি তার শিকার হল কেন? একা ক্রুশ্চেভের জন্যই সেটা হয়ে গেল? শুধু ক্রুশ্চেভের জন্যই কি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির অধঃপতন হয়ে গেল? আসলে সোভিয়েত পার্টির মধ্যে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার যে মান থাকা উচিত ছিল, তা ছিল না। স্ট্যালিনকে মানাটা অন্ধভাবে মানা ছিল। এটা কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন। স্ট্যালিন যতক্ষণ ঠিক রাস্তা দেখিয়েছেন ততক্ষণ অন্ধভাবে মানলেও তা ক্ষতি করেনি। এই অন্ধতার অর্থ হল, নেতৃত্বের সঙ্গে দ্বান্দিক সম্পর্কে যাওয়ার জন্য চেতনার যে মানটা থাকার দরকার ছিল, তা ছিল না। তার ফলে স্ট্যালিন পরবর্তী নেতৃত্ব যে অধঃপতিত হচ্ছে, এটা র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল ধরতে পারল না। স্ট্যালিনকে যেমন অন্ধভাবে মেনেছে, আবার স্ট্যালিনকে অন্ধভাবে অস্বীকার করাটাও অন্ধভাবে মানল। একই অন্ধতা থেকে দুটো বিপদ এল। না হলে তো দলের অভ্যন্তরে প্রচণ্ড লড়াই হত। এই যান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার প্রাধান্য ছিল বলেই এটা ঘটল। স্ট্যালিন বলেছেন চেতনার মান বাড়ছে না। চেষ্টাও করেছেন কিন্তু পারেননি। এর সাথে শিবদাস ঘোষ আর একটা কথাও বলেছেন। নতুন যে সব সমস্যা আসছে শ্রেণীসংগ্রামের সামনে, বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে, তার যে উত্তর দেয়া দরকার, আধুনিক বিজ্ঞানের নব নব যে আবিষ্কারগুলোর ফলে দার্শনিক পরিমণ্ডলে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল এবং মার্কসবাদ বুর্জোয়া আক্রমণের মুখে পড়েছিল, তা যে মোকাবেলা করা দরকার, সেটা হয়নি। একটা হচ্ছে, মার্কসবাদের যতটুকু বিকাশ হয়েছে তাকে ভিত্তি করে চেতনার মান বাড়ানো। যেমন আগে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের যে ভূমিকা ছিল, আজকে তা নেই। সে এখন চূড়ান্ত বিপ্লব বিরোধী, প্রগতি বিরোধী। এটা তো দেখাতে হবে। এরকম আরও যে সব সমস্যা আসছে তার উত্তর করতে হবে। এগুলো না হলে মার্কসবাদের যে পুরোনো ডেভেলাপমেন্ট শুধু তার ভিত্তিতে চেতনা আসবে না, তা উন্নত হবে না। ফলে আন্তর্জাতিকভাবে এবং সোভিয়েতের মধ্যেও যে সব আদর্শগত প্রশ্নগুলো আসছিল তার জবাব দেওয়া হয়নি। সেই জবাব দিয়ে গেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। একে নতুন অবদান বলবেন কি বলবেন না, সেটা অন্য বিষয়। ফলে মার্কসবাদ, মাও সেতুং পর্যন্ত যার বিকাশ, শুধু সেটা দিয়ে চলবে না। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে যে সব প্রশ্ন উঠেছে তার জবাব দিয়ে গেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। অর্থাৎ লেনিনের পর কমরেড শিবদাস ঘোষ। এ কথাটা আমাদের গুরুত্ব দিয়ে বলতে হবে।

স্ট্যালিন অনুভব করেছিলেন, বলেওছিলেন, সমস্ত সমস্যার কথা বলেছিলেন তা নয়। বলেছিলেন, দর্শনগত ক্ষেত্রে আমাদের বিকাশ ঘটেনি, আদর্শগত ক্ষেত্রে ঘটেনি। আর শেষ জীবনে তিনি বুঝেছিলেন, এটাই তার বড়ত্বের পরিচয় যে, পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত মালিকানা গেলেও মানসিকতায় তাকে ভিত্তি করে প্রাইভেট প্রপার্টি মেন্টালিটি ও এথিক্স থেকে গেছে। এ কথার মানে ব্যক্তিবাদের সমস্ত সমস্যা বুঝে যাওয়া নয়, যেটা শিবদাস ঘোষ বুঝে দেখিয়েছেন। কিন্তু স্ট্যালিন যে কথাটা ধরেছিলেন মাও সে তুং সে কথা বলতে পারেননি। মাও বুর্জোয়া কালচার বলেছেন, কিন্তু তা দিয়ে তো বোঝা যাবে না। তা দিয়ে বোঝা যাবে না আক্রমণটা কি ধরনের। মাও সেতুং শেষ জীবনে বলেছিলেন, সুপারস্ট্রাকচার থেকে, সংস্কৃতি থেকে পুঁজিবাদের আক্রমণ আসছে। এটা তার গ্রেটনেস। একে মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু মোকাবিলা করার অস্ত্রের সন্ধান তিনি দিতে পারেননি। যেটা কমরেড শিবদাস ঘোষ চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে আলোচনা করেছেন। এই দুই মহান নেতার মহত্ত্ব যে তারা শেষ জীবনে হলেও সমস্যাটা ধরতে পেরেছিলেন, যেটা শিবদাস ঘোষ অনেক আগে "অন স ্টেপস টেকন এগেনস্ট স্ট্যালিন"–এ দেখিয়েছিলেন। আরেকটা কথা বলতে চাই। সোভিয়েত পার্টির প্রতি অন্ধতার ফলে গোটা আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের কী অবস্থা দাঁড়াল। ১৯৪৮ সালে অনেকটা ভবিষ্যৎ বাণীর মতো যেটা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন। যখন আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের অভাবিত অগ্রগতি ঘটছিল, এবং স্ট্যালিনকে লিডার মেনে, অথরিটি মেনে ঐক্যও ছিল বিরাট, তখন কমরেড শিবদাস ঘোষ এর গাছতলায় দুবেলা খাওয়ার সংস্থানও নেই তখন তিনি বলেছিলেন, সাম্যবাদী আন্দোলনের চিন্তা পদ্ধতি বহুলাংশেই যান্ত্রিকতার দ্বারা প্রভাবিত। যেই সোভিয়েত পার্টি বলল, স্ট্যালিন ভুল, তৎক্ষণাৎ ব্রিটেন, ইটালি, ফ্রান্সের সব বিরাট বিরাট কমিউনিস্ট পার্টিগুলো সব ভুল বলতে শুরু করে দিল। সোভিয়েট পার্টি সংশোধনবাদী হয়ে গেল, অথচ এই পার্টিগুলোর সংগ্রাম কম ছিল না। এরা শ্রমিক শ্রেণীর কত আন্দোলন, ফ্যাসিবাদবিরোধী কত সংগ্রাম করেছে, এতদসত্ত্বেও আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের প্রতি অন্ধ আনুগত্য, দ্বান্দিক সম্পর্ক না থাকা এদের কোথায় ঠেলে দিল। মস্কো-পিকিং যেই দু'ভাগ হল, এই সব পার্টিগুলো আলাদা আলাদা ভাগ হয়ে গেল। এই দ্বান্দিক সম্পর্ক বলতে কী বোঝায় 'কেন এস ইউ সি আই' বইতে কমরেড শিবদাস ঘোষ আলোচনা করেছেন। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। আমাদের পার্টি কেন এই সমস্যায় পড়ল না? শিবদাস ঘোষের চিন্তায় আমরা স্ট্যালিন বা মাও সে তুং-কে মেনেছি।

আর একটা হুঁশিয়ারী ১৯৪৮ সালে তিনি দিয়েছিলেন। টিটোর ঘটনা কেন জন্ম নিল তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না করে শুধু টিটোকে বহিষ্কার করার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হবে না, সংকট আরো বাড়বে। ঘটলও তাই গোটা পূর্ব ইউরোপ বিদ্রোহ করল। বলকান জাতীয়তাবাদকে ভিত্তি করে । বলকান জাতীয়তার বিপদের এই কথাটা শিবদাস ঘোষই তুলেছিলেন। ফলে মানবতাবাদী মূল্যবোধ দিয়ে যে চলবে না, সর্বহারা মূল্যবোধ চাই, ব্যক্তিবাদ থেকে মুক্ত না হয়ে আজকের দিনে উন্নত কমিউনিস্ট হওয়া যাবে না এটা কমরেড শিবদাস ঘোষের ইলাবরেশন নয়, নতুন অবদান। ফ্যাসিবাদ এবং অস্তিত্ববাদ যে একই বুর্জোয়া মানবতাবাদের দুটো রূপ, ফ্যাসিবাদ কী, অস্তিত্ববাদ কী, এটা একমাত্র তিনিই দেখিয়েছেন। এদের মধ্যে ব্যক্তির অ্যাবসোলিউট স্বাধীনতা ধারণা এল কোথা থেকে সেটাও তিনিই নির্দেশ করেছেন। এরা ভাববাদ বিরোধী বস্তুবাদে বিশ্বাসী, কিন্তু ভাব যে বস্তু থেকেই এসেছে এ কথা মানতে রাজি নন।

বিগ ব্যাং থিয়োরির ভ্রান্তি তিনিই দেখিয়েছেন। এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্স বলতে বুঝতে হবে, ইউনিভার্সের মধ্যে আগে ছিল না, তা আসছে, অর্থাৎ বিকাশ ঘটছে। ছোট থেকে বড় হচ্ছে তা নয় নতুন নতুন জিনিস আসছে। অনিশ্চয়তার তত্ত্ব, ল অব ডিটারমিনিজম, ল অব প্রবাবিলিটি, এ সবকে ভিত্তি করে যে সায়েন্টিফিক মিস্টিসিজমের চর্চা চলেছিল, যা মার্কসবাদকে ভুল প্রমাণ করতে চেয়েছে তার প্রতিটির জবাব তিনি দিয়েছেন। লেনিন যেমন তার সময়ে মাখকে, অ্যাভেরিনাসের চিন্তাকে ফাইট করে মার্কসবাদকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, পরবর্তীকালে সেটা কে করেছে? কমরেড শিবদাস ঘোষই তো!

'পারসোনিফিকেশন অব দি কালেকটিভ লিডারশীপ'- এই কনসেপ্ট আনবার হিস্টোরিক নেসেসিটি দেখা দিয়েছিল যখন ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনকে আক্রমণ করতে গিয়ে এই ধারণার সৃষ্টি করেছিলেন যে, কোন লিডারশীপকে মানা মানেই কাল্ট অফ পারসোনালিটি হয়ে যায়। পার্টির সিসি'র সকলেই পার্টির লিডার। জেনারেল সেক্রেটারীর কাজ যেন সকলের কাজ কোঅর্ডিনেট করা। এই সংশোধনবাদী ধারণা বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে এসে যায়। আবার একে ফাইট করতে গিয়ে উল্টো এমন ধারণা এসেছিল যে, সব আন্দোলনেরই নেতা থাকে, যুদ্ধে সেনাপতি থাকে, তেমনই কমিউনিস্ট পার্টির একজন নেতা চাই। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, ধর্মীয় আন্দোলনের নেতা, বুর্জোয়া আন্দোলনের নেতা এবং সর্বহারা শ্রেণীর নেতার মধ্যে পার্থক্য আছে, এরা এক ধরনের নয়। মার্কস থেকে মাও সব নেতা-ই যৌথ সংগ্রামের ফল। অর্থাৎ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনের সর্বক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে যৌথ সংগ্রামের পরিক্রমায়, সংগ্রামে নিযুক্ত সকল নেতা-কর্মীর চিন্তার দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত জ্ঞান যে নেতার মধ্যে দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠরূপে ব্যক্ত হয়, তিনিই যৌথ নেতৃত্বের সুনির্দিষ্ট অভিব্যক্তি হিসেবে সামনে আসেন। মার্কস থেকে মাও সকল নেতাই এভাবেই এসেছেন। যদিও তাঁদের অভ্যুত্থান যে এই পদ্ধতিতেই এ কথা কমরেড ঘোষের আগে কেউ বলেনি, তার ফলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

[গত ২৯ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল '১৩ অনুষ্ঠিত পার্টির জেলা আহ্বায়ক-সমন্বয়ক-সদস্য সচিবদের সভায় পঠিত]

বাংলাদেশ কি পাকিস্তান-আফগানিস্তানের পথে যাবে?

(*প্রথম পৃষ্ঠার পর*) এর সাথে যুক্ত কওমী মাদ্রাসাভিত্তিক ইসলামী দলগুলো অনেকেই বিএনপি-জামাত নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটভুক্ত ইসলামী ঐক্যজোটের অংশীদার। মহাজোট সরকার এদের সাথে যোগাযোগ ও আলোচনার মাধ্যমে ম্যানেজ করা এবং নিজেদের 'ইসলামী' প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। গত ৬ এপ্রিল হেফাজতের লংমার্চের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, সরকার তাদের দাবি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী একটি আলোচনায় মদিনা সনদ অনুযায়ী দেশ পরিচালনার কথা বলেছেন। সরকার ইতিমধ্যে অভিযোগের প্রেক্ষিতে কয়েকজন ব্লগারকে গ্রেপ্তার করেছে এবং এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য ওলামাদের যুক্ত করে একটি কমিটি গঠন করেছে। এদিকে, গত ১০ এপ্রিল পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকাস্থ বিদেশি রাষ্ট্রদূত ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের ডেকে বলেছেন, হেফাজতের ১৩ দফা মানা সম্ভব নয়। জামাত ও হেফাজতের তৎপরতা তুলে ধরে তিনি তাদের ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন যে আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে মৌলবাদ-জঙ্গীবাদের বিপদ থেকে রক্ষার সংগ্রাম করছে এবং এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন প্রয়োজন। তিনি আরো বলেছেন, অসাম্প্রদায়িকতা বনাম মৌলবাদ – বাংলাদেশ কোন্ পথে যাবে তা নির্ধারণে আগামী নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মধ্যে জামাত ও হেফাজতের মত মৌলবাদী শক্তির ক্রমবর্ধমান আস্ফালনকে প্রচারে এনে আওয়ামী লীগ নিজের গণবিরোধী শাসনের ব্যর্থতা জনগণকে ভুলিয়ে দিতে চায় এবং অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তিকে আগামী নির্বাচনে কাজে লাগাতে চায়। অন্যদিকে, বিএনপি হেফাজতে ইসলামের দাবির প্রতি আনুষ্ঠানিক সমর্থন ঘোষণা করে সরকারবিরোধী আন্দোলনে তাদের কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। এভাবে, আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষিতে ভোটের রাজনীতির স্বার্থে আওয়ামী লীগ-বিএনপি দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টিতে হেফাজতের গুরুত্ব বাড়ছে। কিন্তু নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে এই ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে প্রশ্রয় দেয়ার ফলে বিপদগ্রস্ত হচ্ছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।

হেফাজতে ইসলামের ১৩ দফা প্রসঙ্গে আসা যাক্। ইসলাম অবমাননা রোধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে যে আইন প্রণয়নের কথা তারা বলছেন তা পাকিস্তানে প্রচলিত ব্লাসফেমি আইনের সমতুল্য। বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে ধর্ম সংক্রান্ত অপরাধ রোধ করার জন্য ৫টা ধারা রয়েছে। ২৯৫ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কেউ কোন শ্রেণীর মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত করার উদ্দেশ্যে কোন উপাসনাস্থল বা এমন কোন স্থানকে যা কোন শ্রেণীর মানুষ পবিত্র জ্ঞান করে, তেমন কোন স্থান ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত করে, তবে তার জন্য দু'বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। ২৯৫ক ধারায় বলা হয়েছে, কেউ যদি স্বেচ্ছায় এবং বিদ্বেষপ্রসূতভাবে কোন বক্তব্য বা লেখার দ্বারা কোন শ্রেণীর নাগরিকের ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত করে, তবে সে দু'বছরের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করবে। ২৯৬ ধারায় আছে, আইনসম্মতভাবে অনুষ্ঠিত কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বা সমাবেশের কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করলে এক বছরের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। ২৯৭ ধারায় আছে, কারো অনুভূতিকে আহত করার উদ্দেশ্যে বা কারোর ধর্মীয় অনুভূতিকে অপমান করার উদ্দেশ্যে অথবা কারোর এরূপ অনুভুতির কথা জানা থাকা স্বত্ত্বেও যদি কেউ কোন উপসনালয়ে বা কবরস্থান/শ্মশান-এরূপ স্থানে প্রবেশ করে তবে এক বছরের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। ২৯৮ ধারায় আছে, কারোর ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত করার উদ্দেশ্যে কোন শব্দ উচ্চারণ করলে এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হবে। ওই পাঁচটি ধারার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে কোন ধর্মের অনুসারী মানুষদের নিজ নিজ বিশ্বাস অনুসারে ধর্ম পালনের অধিকার নিশ্চিত করা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার অপচেষ্টা রোধ করা। যে কারণে প্রত্যেকটা ধারায় সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে ক্রিয়াটা সংঘটিত হয়েছে কিনা তা অভিযোগ উত্থাপনকারীকে প্রমাণ করার বিধান রয়েছে। এছাড়া তথ্যপ্রযুক্তি আইন ও ..... আইনেও অনুরূপ বিধান রয়েছে। এরপরও নতুন আইনের দাবি করার উদ্দেশ্য কি?

একটা গণতান্ত্রিক সমাজে ধর্মে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী প্রত্যেকে নিজ মতের সপক্ষে ও অন্যের মতের বিরুদ্ধে বলার বা লেখার অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। গণতান্ত্রিক চেতনা মানুষের অনুভুতিকে এতটা আলোকিত করে যে, নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললেই অনুভূতি আহত হয় না। জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে নানা রকম চিন্তা ও মতের ব্যাপক আদান-প্রদান এবং বিরুদ্ধ মতের প্রতি সহিষ্ণুতা গণতান্ত্রিক সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উদঘাটিত এই সত্য প্রচারের অপরাধে ওই সময় বিজ্ঞানী ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল এবং গ্যালিলিওকে আমৃত্যু কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল। কারণ তাঁদের আবিস্কৃত সত্য বাইবেল বিশ্বাসীদের অনুভূতিকে আহত করেছিল। আজ নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রশ্নে কোন সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা বা বিশ্লেষণ অথবা বিভিন্ন ধর্মতত্ত্বের আলোকে আধুনিক যুগে নারী অধিকার প্রশ্নে কোন বিশ্লেষণ অথবা প্রকৃতি বিজ্ঞানে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত কোন বিশ্লেষণকে কেউ অসৎ উদ্দেশ্যে কোরআনের কোন অংশের পরিপন্থী হিসেবে ব্যাখা করে মামলা করে দিতে পারে। এক্ষেত্রে কোরআনকে হেয় করার বা কারোর ধর্ম পালনের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার কোন উদ্দেশ্যই হয়তো আলোচক বা বিশ্লেষকের ছিল না। তেমনি হযরত মোহাম্মদ সম্পর্কে কোন উক্তি বা লেখার জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে অথচ ঐরূপ উক্তি বা লেখার পেছনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হয়তো কোন অপরাধমূলক উদ্দেশ্য ছিল না।

ব্লাসফেমি আইন পাকিস্তানে এক অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এই আইনের ফলাফল হিসাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং জনগণের মধ্যে বিভেদ-বিভ্রান্তি এমন মাত্রায় পৌঁছেছে যে, কাদিয়ানী, শিয়া, সুন্নী প্রভৃতি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এক সম্প্রদায়ের মানুষ আর এক সম্প্রদায়ের মসজিদের মধ্যে ঢুকে গুলি চালিয়ে বোমা ছুঁড়ে খুনোখুনি করছে। সংখ্যালঘু অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর নিপীড়ন চালানো এবং কায়েমী স্বার্থ উদ্ধারের বৈধ লাইসেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এই আইন। কয়েকবছর আগে Amensty International পাকিস্তানে ব্লাসফেমি আইনের ব্যাপক অপপ্রয়োগ এবং ওই আইনে মানবাধিকার লংঘনের ওপর এক রিপোর্ট প্রকাশ করে। ওই রিপোর্ট থেকে স্থানাভাবে শুধু একটি ঘটনা উল্লেখ করা হল। পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের ফয়সলাবাদ জেলার লন্ড্রি কর্মচারী আনোয়ার মাশী খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী। একদিন, ১৯৯৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি আনোয়ার মাশীর সঙ্গে তার এক মুসলিম বন্ধু মোহাম্মদ আলমের ঝগড়া হয়। উত্তেজনা বশে উভয়ে পরস্পরের ধর্ম নিয়ে কটূক্তি ও বাদানুবাদ করে। এটা ঘটার পর আবার তাদের মধ্যে মিলমিশ হয়ে যায় এবং এ নিয়ে মোহাম্মদ আলম কোথাও কোন অভিযোগ করেনি। কিন্তু ঘটনাটি লোকমুখে শুনে ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠন 'আঞ্জুমান সিপাহী সাহাবা'-র নেতা হাজী মোহাম্মদ তৈয়ব আনোয়ারের বিরুদ্ধে ব্লাসফেমি আইনে মামলা রুজু করে। প্রতিহিংসার শিকার হয়ে কয়েকবছর জেল খাটতে হল আনোয়ারকে। এই আইনের ব্যাপক অপপ্রয়োগ এবং এর ফলে সৃষ্ট অসহিষ্ণুতা দেখে পাকিস্তানে ব্লাসফেমি আইন বাতিলের দাবি উঠেছে। এ ধরণের মত প্রকাশ করায় একজন গভর্নর ও এক মন্ত্রী মৌলবাদীদের হাতে খুন হয়েছেন।

ইসলাম ধর্মে কোথাও কোরআন বা নবীকে অবমাননার জন্য শাস্তি প্রদানের দায়িত্ব মানুষের হাতে দেয়া হয়নি। ধর্ম মতে আধ্যাত্মিক বিষয়ে ন্যায়-অন্যায় বিচারের ভার সৃষ্টিকর্তার উপর ন্যস্ত থাকে। কোরআনের সূরা নিসার ১৪০ নং আয়াতে বলা হয়েছে-" আর তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর কোন আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং ঐটিকে বিদ্রুপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হয় তোমরা তাদের সাথে বসো না, নতুবা তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। কপট ও অবিশ্বাসী সকলকেই আল্লাহ্ নরকে (জাহান্নামে) একত্র করবেন।" (কোরআন শরীফ; অনুবাদ – মাওলানা মোবারক করীম জওহর) এই আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, যদি কেউ কোরআন অবমাননা করে বা কোরআনের কোন আয়াতকে বিদ্রুপ করে তবে তার সঙ্গ এড়াতে হবে। তাকে পাথর ছোড়া, তার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া বা তাকে ফাঁসি দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়নি। এর জন্য পরকালে স্বয়ং আল্লাহ্ শাস্তি দেবেন। এই হচ্ছে কোরআনের বিধান। কোরআনে অন্যত্র আবার এই কথাই বলা হয়েছে। সূরা আন আমের ৬৮ ও ৬৯ নং আয়াতে আছে "তুমি যখন দেখ, তারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে নিরর্থক আলোচনায় মগ্ন হয় তখন তুমি দূরে সরে পড়বে যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পরে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না। ওদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যারা সাবধানতা অবলম্বন করে, তবে, উপদেশ দেওয়া তাদের কর্তব্য যাতে ওরাও সাবধান হয়।" (ঐ) এই আয়াত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে পরিষ্কার বলা আছে – যারা সীমা লংঘন করছে তাদের কৃতকর্মের দায় অন্যদের বহন করতে হবে না। অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে ঈমানদারদের ভাবতে হবে না, তবে শুধু উপদেশ দেয়া চলবে।

এই আইন না থাকতেই গ্রাম-গ্রামান্তরে ফতোয়াবাজরা যেভাবে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়, ব্লাসফেমি আইনের আশ্রয় এবং আর্শীবাদ পেলে যে কী অবস্থা হবে তা ভাবাই কঠিন। এখনও তারা বিভিন্ন লেখক লেখিকাকে ধর্মদ্রোহী, মুরতাদ ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে হত্যা করার প্রকাশ্য ঘোষণা দিচ্ছে। একজন ব্লগারকে ইতিমধ্যেই হত্যা করা হয়েছে, আরেকজনকে হত্যার চেষ্টা হয়েছে।

হেফাজতের দাবিনামার ৮ নং দফায় প্রকাশ্যে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ বন্ধের দাবি জানানো হয়েছে। এই দাবি মানতে হলে ৩০ লাখ নারী গার্মেন্টস শ্রমিকের অবস্থা কি দাঁড়াবে? যে নারীরা গৃহকর্মী হিসেবে, ইটভাটায়, দোকানপাট ও অফিস-আদালতে পুরুষের পাশাপাশি কাজ করছেন তাদের কি গৃহবন্দী হয়ে থাকতে হবে? স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েরা কি ছেলেদের সাথে একসাথে পড়তে পারবে না?

৯ নং দফায় 'দেশব্যাপী রাস্তার মোড়ে ও কলেজ-ভার্সিটিতে ভাস্কর্যের নামে মূর্তি স্থাপন বন্ধ' করার দাবি জানানো হয়েছে। হেফাজতের অনুসারীরা ভাস্কর্য মাত্রকেই মূর্তিপূজা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। এরা অনেকে শহীদ মিনারে ফুল দেয়াকে পাথর পূজা বলে প্রচার করেন। কোন ক্রিয়া সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে হলে তার উদ্দেশ্য ও ফলাফল বিচার করতে হয়। শিশুরা যখন পুতুল নিয়ে খেলে তার মধ্যে নির্দোষ আনন্দ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না। ঘর সাজাতে ছোট মূর্তি বা পুতুল ব্যবহৃত হলে তার উদ্দেশ্য কেবল সৌন্দর্যবর্ধন, তা মানুষের মনে অন্যায় কোন ভাব জাগায় না। তেমনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অপরাজেয় বাংলা' ভাস্কর্য বা শহীদ মিনার দর্শকের মনে ধর্মদ্রোহিতা তৈরি করে না, বরং বাঙ্গালীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে দেশপ্রেমের অনুভূতি জাগায়। দেখা যাচ্ছে, হেফাজত আফগানিস্তানের তালেবানদের অনুরূপ ধ্যান-ধারণার অনুসারী, যারা হাজার বছরের পুরনো বামিয়ানের বৌদ্ধমূর্তি ধ্বংস করেছিল। অথচ 'খোলাফায়ে রাশেদীন'-এর আমলে মুসলমানরা যখন মিশর জয় করে তখন সেখানকার স্ফিংকস মূর্তি, পিরামিড বা অন্যান্য ঐতিহাসিক নিদর্শন ধ্বংস করেনি।

যারা সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে হেফাজতে ইসলাম-কে কাজে লাগাতে চাইছেন তাদের ভাবা দরকার তারা দেশকে কোথায় নিয়ে যেতে চান? হেফাজত নারীর সমানাধিকারকে অস্বীকার করে, তাই নারীনীতিকে 'ইসলামবিরোধী' আখ্যা দিয়ে ধর্মপ্রাণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়। কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবি সমাজে অসহিষ্ণুতা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপের নজির সৃষ্টি করবে। কে মুসলমান, কে নয় – এই সার্টিফিকেট দেয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের হতে পারে না। হেফাজতীদের পশ্চাদপদ কূপমণ্ডুক দৃষ্টিভঙ্গি শেষ পর্যন্ত কায়েমী স্বার্থের পক্ষে যায়। যেমন, সম্প্রতি সাভারে ভবন ধ্বসে ৫ শতাধিক শ্রমিক হত্যার ঘটনায় দেশবাসী যখন খুনী ভবন মালিক ও গার্মেন্টস মালিকদের বিচার চাইছে, তখন হেফাজত নেতারা একে 'আল্লাহ্র গজব' আখ্যায়িত করে প্রকারান্তরে দায়ীদের আড়াল করলেন। ফলে, হেফাজতে ইসলাম যে মধ্যযুগীয় প্রতিক্রিয়াশীল ১৩ দফা উত্থাপন করেছে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া দরকার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি রক্ষার প্রয়োজনে।

বাসদের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত

বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে দুইদিনব্যাপী কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সভা ১১ ও ১২ এপ্রিল জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, সভা পরিচালনা করেন কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। দলের অভ্যন্তরে শোধনবাদ-সংস্কারবাদ বিরোধী মতাদর্শগত সংগ্রামের বিশেষ পরিস্থিতিতে আহুত এ প্রতিনিধি সভায় বাসদের ৩৩টি জেলার ৪ শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

সভায় দেশের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে একটি শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং গণআন্দোলনের কার্যকর শক্তি গড়ে তোলার জন্য দলের নেতা-কর্মী-সমর্থক-শুভানুধ্যায়ী, শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষসহ দেশের বাম-গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রতিনিধি সভায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রবীণ বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং আজীবন সংগ্রামী এই বীর বিপ্লবীর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

যুবলীগ সন্ত্রাসীদের হামলায় গাজীপুরে বাসদের ৬ নেতাকর্মী আহত

বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ২৬ এপ্রিল এক বিবৃতিতে সাভারে গার্মেন্টস শ্রমিক হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে যুবলীগ সন্ত্রাসীদের হামলায় ৬ বাসদ নেতাকর্মী আহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি অবিলম্বে হামলাকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি করেন।

২৬ এপ্রিল সকালে সাভারে শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে চান্দনা চৌরাস্তায় শ্রমিকদের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে বাসদ কোনাবাড়ী-কাশিমপুর শিল্পাঞ্চল শাখার একটি মিছিল জেলা কমিটির সদস্য মশিউর রহমান খোকন ও শ্রমিক ফ্রন্ট নেতা শাহ জালালের নেতৃত্বে গাজীপুর চান্দনা চৌরাস্তার দিকে আসছিল। ভাওয়াল বদরে আলম কলেজ এলাকা পার হওয়ার পর পরই একদল যুবলীগ নামধারী সন্ত্রাসী অতর্কিতে মিছিলটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং লাঠি, কাঠের চ্যালা প্রভৃতি দিয়ে মিছিলকারীদের বেপরোয়া মারধর করে। হামলায় জেলা কমিটির সদস্য মশিউর রহমান খোকন, শ্রমিক ফ্রন্ট নেতা শাহ জালাল, বাসদ কর্মী আবু সুফিয়ান, ইকবাল হোসেন, অলি আহমেদ এবং রাই বিনোদিনী সহ ৮/৯ জন আহত হন। কমরেড শাহ জালালকে গুরুতর আহত সংজ্ঞাহীন অবস্থায় স্থানীয় ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। তার মাথায় ১৪টি সেলাই দিতে হয়েছে।

মলয় সরকারের গ্রেফতারের প্রতিবাদ, মুক্তি দাবি

বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ৩০ এপ্রিল এক বিবৃতিতে শ্রমিক গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে লিফলেট বিলি করার সময় তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকার নাবিস্কো মোড় থেকে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও তেজগাঁ থানা বাসদ নেতা মলয় সরকারের গ্রেফতারের ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ ও অবিলম্বে মলয় সরকারের মুক্তি দাবি করেন।

মার্কসবাদের বিপ্লবী প্রাণসত্ত্বাকে রক্ষা করুন

(শেষ পৃষ্ঠার পর) এই আন্দোলনকে ইসলামবিরোধী আখ্যা দিয়ে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে দেশের মধ্যে সহিংস পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে, যার সুযোগ নিয়ে ক্ষমতা বহির্ভূত বুর্জোয়া শক্তি ক্ষমতায় যাওয়ার পথ সুগম করতে চাইছে। নীতি-আদর্শহীন বুর্জোয়া রাজনীতির প্রশ্রয়ে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিরাপত্তাহীনতায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ফলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যে দাবি দীর্ঘদিন ধরে জনগণের মধ্যে ছিল, ক্ষমতার রাজনীতিতে আজ তাকেই দু'দল দু'ভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে। এর সাথে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন, নৈতিক অবক্ষয়সহ পুঁজিবাদী শাসন-শোষণের সাধারণ সংকটগুলো প্রতিনিয়ত বাড়ছে। কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি, সাধারণ মানুষের শিক্ষা-চিকিৎসার অধিকারহীনতা ইত্যাদি বহুবিধ সংকটে আমরা জর্জরিত। সম্প্রতি হেফাজতে ইসলামী ইসলাম রক্ষার নামে যে সকল দাবি উত্থাপন করেছে তা দেশের গণতন্ত্রমনা অসাম্প্রদায়িক মানুষের জন্য অশনিসংকেত। এরই সাথে বাংলাদেশকে ঘিরে মার্কিন-ভারত সাম্রাজ্যবাদী বলয়সহ পরাশক্তিগুলোর নানাবিধ তৎপরতায় দেশপ্রেমিক মানুষ উদ্বিগ্ন। জনগণের মনে এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে – এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের পথ কি? এরকম একটি সময়ে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জনগণের সামনে বাম-গণতান্ত্রিক শক্তি সুসংগঠিতভাবে উপস্থিত থাকলে জনগণ হয়ত পথ পেত, লড়াইয়ে নামত। কিন্তু তা এখনও সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

বন্ধুগণ,

এদেশের মানুষ স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে শোষণ-বৈষম্য-নিপীড়নের বিরুদ্ধে বারেবারে লড়াই করলেও বহু প্রত্যাশিত ও আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি আসেনি। গণআন্দোলনে সঠিক আদর্শ ও সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পারাই এর মূল কারণ। এদেশের বামপন্থীরা প্রতিটি গণসংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, গরিব মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকে আত্মত্যাগের বহু নজির সৃষ্টি করেছে। কিন্তু নানাবিধ ভাবাদর্শগত সংকটে বাম আন্দোলন বর্তমানে দুর্বল অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। আদর্শগত বিভ্রান্তি, সংশোধনবাদী চিন্তার প্রভাব, সুবিধাবাদ ও হঠকারী বিচ্যুতি, বুর্জোয়াদের লেজুড়বৃত্তির প্রবণতা, পেটিবুর্জোয়া সংকীর্ণতা ও ব্যক্তিবাদী চিন্তার প্রভাব – ইত্যাদি কারণ এর জন্য দায়ী।

বিশ্ব পরিসরে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে সংশোধনবাদ যখন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে, যখন এদেশের বাম আন্দোলন ক্ষয়িষ্ণু দশার দিকে যাচ্ছে, ঠিক সে সময় ১৯৮০ সালের ৭ নভেম্বর বাসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুকাল পরেই বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটে, বাংলাদেশের বামপন্থীরাও পথ হারিয়ে হতচকিত হয়ে পড়ে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে বাসদ ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে এবং নীতিনিষ্ঠ সংগ্রামের জন্য বাম মহলে বিশিষ্টতা অর্জন করে। কিন্তু একটা পর্যায়ে এসে দলের এই আদর্শগত ও সাংগঠনিক বিকাশ স্থবিরতার মধ্যে পড়ে – যার কারণ ঘোষিত নীতিমালা থেকে প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের ক্রমাগত বিচ্যুতি।

বাসদ প্রতিষ্ঠালগ্নে সর্বহারাশ্রেণীর সঠিক বিপ্লবী দল গড়ে তোলার সংগ্রামের কিছু নীতি ঘোষণা করেছিল। জাসদ থেকে বাসদ গঠিত হওয়ার পর ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত 'সর্বহারাশ্রেণীর দল গঠনের সমস্যা প্রসঙ্গে' পুস্তিকায় যা উলে-খিত আছে। আমরা বলেছিলাম – শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রব্যাপী মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির চর্চা করতে হবে। কেন্দ্রীয় নেতারা সেই সংগ্রামের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। এর প্রাথমিক শর্ত হিসেবে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি দলের কাছে সমর্পণ করতে হবে এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক পারিবারিক জীবনের স্থলে দলের নেতা-কর্মীদের জড়িয়ে যৌথজীবন গড়ে তুলতে হবে। কমিউনিজম যেহেতু যৌথ মালিকানা ও যৌথ স্বার্থের সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, তাই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও ব্যক্তিবাদমুক্ত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের তীব্র সংগ্রাম ব্যতীত চূড়ান্ত ব্যক্তিস্বার্থপরতার এই যুগে কমিউনিস্ট আন্দোলন বেশিদূর এগোতে পারবে না। এ লক্ষ্যে আমরা কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে পার্টি হাউজ-পার্টি মেসকেন্দ্রিক যৌথজীবনের চর্চা শুরু করেছিলাম। আমরা বলেছি – জনগণের মধ্যে কাজ ও গণআন্দোলনের পাশাপাশি নেতা-কর্মীদের মধ্যে প্রতিনিয়ত আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, চিন্তার দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মাধ্যমে জগত ও জীবনের প্রতিটি প্রশ্ন সম্পর্কে সঠিক মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি-বিচার-বিশে-ষণ পদ্ধতি আয়ত্ত করতে আদর্শগত সংগ্রাম দলের অভ্যন্তরে জারি রাখতে হবে। এর মধ্য দিয়ে দলের মধ্যে একই পদ্ধতিতে চিন্তা, চিন্তার ঐক্য, উদ্দেশ্যের ঐক্য, দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য গড়ে উঠবে এবং যৌথ সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় যৌথ জ্ঞানের জন্ম হবে। এই জ্ঞানের ভিত্তিতে ও সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। দলের নেতাদের মধ্যে যিনি দলের সকল সদস্যের সম্মিলিত জ্ঞান-অভিজ্ঞতা সর্বোত্তমরূপে ধারণ করার কারণে সকলের নেতারূপে আবির্ভূত হবেন এবং আদর্শ কমিউনিস্ট চরিত্রের মূর্ত প্রতীক হিসেবে সমগ্র দলের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবেন, তার মাধ্যমে যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত মূর্ত প্রকাশ ঘটবে এবং তিনি হবেন দলের সর্বোচ্চ নেতা। আমরা বলেছিলাম – দল পরিচালিত হবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিমালার ভিত্তিতে এবং দলের নেতৃবৃন্দ হবেন পেশাদার বিপ্লবী (Professional revolutionary), যারা 'দলই জীবন বিপ্লবই জীবন' এই নীতির ভিত্তিতে সামাজিক স্বার্থের সাথে ব্যক্তিস্বার্থকে একাত্ম করার সংগ্রাম করবেন। আজকের দিনে বিপ-বী পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রামের এই সকল নীতিমালা আমরা গ্রহণ করেছি এ যুগের অগ্রগণ্য মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ও নেতা, ভারতের সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট) সংক্ষেপে এসইউসিআই(সি) পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে। শুধু তাই নয়, রাশিয়া ও চীনসহ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয় যে কারণে ঘটলো সেই আধুনিক সংশোধনবাদের উৎস ও তার বিরুদ্ধে যথার্থ সংগ্রামের দিকনির্দেশনা আমরা তাঁর চিন্তা থেকে গ্রহণ করেছি। তিনি বর্তমান কালের প্রয়োজনের নিরিখে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে যুগোপযোগী করে ব্যাখ্যা করেছেন এবং মার্কসবাদী জ্ঞানভাণ্ডারকে বহু দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছেন যা আমরা সঠিক বলে গ্রহণ করেছি। ফলে আমাদের দল গড়ে উঠেছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে এবং মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সেতুঙের পাশাপাশি কমরেড শিবদাস ঘোষকে আমরা আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম শিক্ষক, পথপ্রদর্শক এবং অথরিটিরূপে গণ্য করেছি।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে দল গড়ে তোলার সংগ্রামের মূলনীতিসমূহ আমরা গ্রহণ করেছিলাম। একে ভিত্তি করে সংগ্রামের ফলেই বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয় এবং দেশের অভ্যন্তরে বাম আন্দোলনে প্রবল বিভ্রান্তি সত্ত্বেও আমাদের দল বিকশিত হয়েছে। এদেশের বামপন্থী দলসমূহের মধ্যে বিশিষ্টতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এক পর্যায়ে এসে দলের এই সাংগঠনিক ও আদর্শগত বিকাশ স্থবির হয়ে পড়ে এবং দলের মধ্যে নান-ধরণের সংকট দেখা দিতে শুরু করে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে মার্কসবাদের চর্চার মাধ্যমে ব্যক্তিসম্পত্তি ও সম্পত্তিজাত মানসিকতা থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রাম, যৌথতা ও যৌথ জীবনের চর্চা, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে দল পরিচালনা, যৌথ নেতৃত্ব ও তার বিশেষীকৃত রূপ গড়ে তোলার সংগ্রাম ইত্যাদি দল গড়ে তোলার ঘোষিত নীতিমালা সঠিকভাবে অনুশীলনের ঘাটতিই এর মূল কারণ। এরই প্রকাশ ঘটেছে যৌথ জীবনের অনুশীলন না করে ব্যক্তিগত পছন্দ বা ইচ্ছার ভিত্তিতে জীবনযাপন, একক ও গোষ্ঠীগত সিদ্ধান্তে দল পরিচালনা, জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার ঘাটতি, সমালোচনা-আত্মসমালোচনার নীতি অনুসরণ না করা, পার্টির সম্পদ ও তহবিল ব্যবস্থাপনায় যৌথতার নিয়ম লঙ্ঘন ইত্যাদির মাধ্যমে। বেশ কিছুদিন ধরে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশের এ সকল ঘাটতি নিয়েই দল চলছে, কিন্তু বারংবার তাগিদ সত্ত্বেও দলের বিপ্লবী সত্ত্বা পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে কমরেডদের জড়িয়ে সর্বাত্মক ও কষ্টসাধ্য সংগ্রামের পথ অনুসরণ করা হয়নি।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

দলীয় সংগ্রাম থেকে বিচ্যুতির প্রভাব যেমন কেন্দ্রীয় সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দের একাংশের জীবনাচরণ ও কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হচ্ছে, তেমনি পার্টির রাজনৈতিক কর্মসূচি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এতদিনকার অনুসৃত লাইন থেকে ভিন্নতা দেখা দিচ্ছে। গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর বাসদ-সিপিবি আহূত হরতালে 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, জামাত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করা'কে প্রধান ইস্যু নির্ধারণ ও এতে সরকারের সমর্থন দ্বি-দলীয় ধারার বাইরে বাম বিকল্প শক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাসদ-এর ধারাবাহিক নীতিনিষ্ঠ অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। অথচ, তাজরিন গার্মেন্টসে অগ্নিকাণ্ডে ১২৪ জন শ্রমিক হত্যার নিষ্ঠুরতম ঘটনার প্রতিবাদে সরকার ও মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আমরা হরতাল ডাকতে পারিনি সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতার কথা বলে। মূল্যবৃদ্ধিসহ জনজীবনের সংকট নিয়ে প্রতিক্রিয়াধর্মী কর্মসূচির বাইরে ধারাবাহিক গণআন্দোলন গড়ে তুলতে পারিনি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি এবং মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতার উত্থানের বিরুদ্ধে আন্দোলন অবশ্যই বর্তমান সময়ে বামপন্থীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলো নিয়ে ধারাবাহিক ও জঙ্গী গণআন্দোলন, শ্রমিক-কৃষকের দাবিতে সংগ্রাম গড়ে তোলার মূল কর্তব্যের সাথে সমন্বিত করে মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ভাবাদর্শগত-সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে। এক্ষেত্রে আক্রমণের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণী ও তার প্রতিনিধিত্বকারী শাসকগোষ্ঠী, মৌলবাদী শক্তি এদেরই অনুষঙ্গ মাত্র। অন্যদিকে, বিকল্প শক্তি গড়ে তুলতে বামপন্থীদের সাথে লিবারেল ডেমোক্র্যাট শক্তির যুগপৎ পদক্ষেপের ওপর কিছুদিন ধরে পার্টি প্রকাশনায় অতিরিক্ত গুরুত্বারোপ করা হচ্ছিল যা বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। লিবারেল ডেমোক্র্যাট হিসেবে যাদের চিহ্নিত করা হচ্ছে তারা লিবারেল ডেমোক্র্যাট কিনা তাও প্রশ্নবিদ্ধ। আবার দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোতে এদের ভূমিকাই খুঁজে পাওয়া যায় না।

সম্প্রতি, দল কোন্ চিন্তার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এবং আগামী দিনে কোন্ চিন্তার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে – তা নিয়েই দলের অভ্যন্তরে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। এতদিন ধরে নেতৃত্বের বক্তব্যে এবং দলীয় প্রকাশনায় কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, এখন বলা হচ্ছে তা ছিল অজ্ঞতাপ্রসূত। দলের অধিকাংশ নেতা-কর্মীর কাছে এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হয়নি। অন্য কথায়, বিপ-বী দল গড়ে তোলার নীতিগত-পদ্ধতিগত সংগ্রাম এবং বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের সংকটগুলোকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই গত কিছু দিন ধরে দুটি ভিন্নমতে দল বিভক্ত হয়ে পড়েছে যা দলের অভ্যন্তরে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিরসন করা সম্ভব হয়নি।

দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশ দল গড়ে তোলার আদর্শগত ভিত্তিকে সংস্কার ও সংশোধন করছেন যা পার্টির মূল চিন্তা থেকে বিচ্যুতিরই নামান্তর। বাহ্যত তারা ঐক্যের কথা বলছেন যদিও কার্যত মূল আদর্শের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেছেন। আমরা দলের আদর্শ, প্রতিষ্ঠাকালীন ঘোষণাকে ধারণ করে এই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। এই সংগ্রামে দেশের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষসহ সকল দেশপ্রেমিক, বাম-গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

প্রিয় বন্ধুগণ,

আপনাদের মাধ্যমে আমরা দেশবাসীকে জানাতে চাই, পুঁজিবাদী শাসন-শোষণের ফলে জনজীবনে ক্রমবর্ধমান সংকট, শিল্প-কৃষি-শিক্ষা ও জাতীয় সম্পদের উপর সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ও ধর্মান্ধ মৌলবাদী শক্তির বিপদজনক উত্থানের বর্তমান পটভূমিতে ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতার বাইরের বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলোর বিপরীতে বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ গণ-সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্যে আমরা সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করব।"

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠের পর বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের সূত্র ধরে সাংবাদিকরা বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, 'কয়েকটি সংবাদপত্রে এভাবে বিষয়টি এসেছে যে আমরা গণজাগরণ মঞ্চ বা সিপিবির সাথে জোট গঠন নিয়ে বিরোধিতা করে দল ভেঙেছি – এবিষয়টি মোটেই সত্য নয়। তরুণ প্রজন্মের গণজাগরণকে আমরা অভাবনীয় ঘটনা মনে করি। তাদের আমরা সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি আমরা অবশ্যই বাস্তবায়ন চাই, পাশাপাশি আমরা এর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে তাজরিন গার্মেন্টসের শ্রমিক হত্যাসহ হাজার হাজার গার্মেন্টস শ্রমিক হত্যার বিচারের দাবিতে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তুলতে চাই। আমরা জাতীয় সম্পদ গ্যাস-কয়লা রক্ষার আন্দোলনকেও গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। প্রতিদিন দেশের নারীরা নির্যাতন-লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছে – এরও প্রতিকার চাই। তরুণ প্রজন্ম যদি এ বিষয়গুলোর বিরুদ্ধেও কথা বলতো তাহলে সরকারের পক্ষে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আন্দোলনকে নিজেদের ফায়দা তোলার কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হতো না।'

বাসদ-সিপিবি জোট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমরা জনগণের সমস্যা নিয়ে সর্বোচ্চ বোঝাপড়া এবং সর্বনিম্ন কর্মসূচির ভিত্তিতে বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে। কিন্তু সিপিবি-র সাথে জোট ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্যের নীতিতে পরিচালিত না হওয়ায় এই জোটের বর্তমান কর্মকাণ্ড দ্বি-দলীয় ধারার বাইরে বাম বিকল্প গড়তে বাসদের দীর্ঘদিনের অনুসৃত রাজনৈতিক লাইনের সাথে কিছু ক্ষেত্রে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে পড়ছে।'

সংবাদ সম্মেলন শেষে একটি মিছিল পল্টন, বায়তুল মোকাররম, স্টেডিয়াম, গুলিস্তান, বঙ্গবাজার, ঢাকা মেডিক্যাল হয়ে শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। বেলা ২টায় শহীদ মিনারে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরীর মরদেহে বাসদ, মহিলা ফোরাম, ছাত্র ফ্রন্টের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

কারমাইকেলে ছাত্র ফ্রন্টের বিক্ষোভ

কারমাইকেল কলেজের শহীদ ছাত্র-শিক্ষকদের নামে একাডেমিক ভবনের নামকরণের দাবিতে গত ২০ এপ্রিল সকালে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

চারণের নববর্ষ উদযাপন

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে ১লা বৈশাখ সকালে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে শিক্ষা, সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন বাসদ নেতা আনোয়ার হোসেন বাবলু, পলাশ কান্তি নাগ, ড. মিজানুর রহমান নাসিম প্রমুখ। আলোচনা শেষে চারণ ও শিশু-কিশোর মেলা শিল্পীরা গান পরিবেশন করে।

ভারতীয় পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী রামপাল

(শেষ পৃষ্ঠার পর) "কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে যে পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড, সালফার-ডাই-অক্সাইড, এসিড বৃষ্টি, নাইট্রোজেন-অক্সাইড, কার্বন-মনোঅক্সাইড, পারদ, সীসা ইত্যাদি বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হয় তার পরিমাণ এতই বেশি যে এ ধরনের বিদ্যুৎকেন্দ্রকে পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে লাল ক্যাটাগরির স্থাপনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে নির্গত পানি আশেপাশের নদী-জলাশয় দূষিত করে। ভারতের সুন্দরবন অঞ্চলে এবং মধ্যপ্রদেশে এ ধরনের একটি প্রকল্পের কথা থাকলেও কৃষি ও পরিবেশগত সমস্যার কারণে সেগুলি বাতিল করা হয়েছে। ভারতীয় পুঁজির স্বার্থে সে-দেশের বাতিল করা প্রকল্প আমাদের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা হচ্ছে।"

বিবৃতিতে দেশের ফুসফুস সুন্দরবন ধ্বংসকারী এবং দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প রুখে দাঁড়ানোর জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

মহান মে দিবস উদযাপন

সাভারে শ্রমিক গণহত্যার বিচার, ন্যূনতম মজুরি ৮০০০ টাকা ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করার দাবি

রংপুর : ১ মে বিকেল ৫টায় সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে নগরীতে র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালি থেকে সাভারে গার্মেন্টস শ্রমিক হত্যার বিচার, নিহত-আহত পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, কর্মস্থলে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত, গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়ন ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানানো হয়।

নওগাঁ : মহান মে দিবস উপলক্ষে নওগাঁ জেলা বাসদ এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। হবিবর রহমান চৌধুরির সভাপতিত্বে আলোচনা করেন ম.আ.ব সিদ্দিকী বাদাম, মতিউর রহমান মিঠু, আসাদ চৌধুরী প্রমুখ। আলোচকরা বলেন শ্রমিকদের মুক্তির জন্য সত্যিকারের একটি বিপ্লবী পার্টি দরকার। একটি বিপ্লবী পার্টি ছাড়া শ্রমিকদের মুক্তি হতে পারে না।

চাঁদপুর : বাসদ জেলা কমিটির উদ্যোগে গত ১ মে সকাল ১১টায় শহরে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও পরে মে দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় জেলার পৌর পাঠাগারে। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা আহবায়ক আলমগীর হোসেন দুলাল। সভায় আরো বক্তব্য রাখেন, বাসদ চাঁদপুর জেলা কমিটির সদস্য *(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

মহান মে দিবসে ঢাকার রাজপথে বাসদের মিছিল

হেফাজতের অগণতান্ত্রিক ১৩ দফার প্রতিবাদে মানববন্ধন

গাইবান্ধা : ১৮ এপ্রিল সকাল ১১টায় সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম গাইবান্ধা জেলা

শাখার উদ্যোগে হেফাজত ইসলাম ঘোষিত ১৩ দফার প্রতিবাদে ১নং রেলগেটে মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের জেলা সভাপতি অধ্যাপক রোকেয়া খাতুনের সভাপতিত্বে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাসদ গাইবান্ধা জেলার সদস্য সচিব মঞ্জুর আলম মিঠু, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সম্পাদিকা রিক্তু প্রসাদ, নারী জোট গাইবান্ধা জেলার সদস্য তছলিমা আক্তার, প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরামের সদস্য সচিব প্রভাষক কাজী আবু রাহেন শফিউল্যা, মহিলা ফোরামের সাধারণ সম্পাদক নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, হালিমা খাতুন প্রমুখ।

রংপুর : হেফাজতের নারীবিদ্বেষী অগণতান্ত্রিক ১৩ দফার প্রতিবাদে গত ৪ মে সকালে মহিলা ফোরাম রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সাভারে শ্রমিক ভাইদের পাশে দাঁড়ান

শ্রমিক সহায়তা তহবিলে সহযোগিতা করুন

যাদের শ্রমে ঘামে গড়া এদেশ, মালিকের মুনাফার যাঁতায় পিষ্ট সেই গার্মেন্ট শ্রমিকের প্রাণ। দিন যায়, বছর যায়, সেই সাথে বেড়ে চলেছে শ্রমিকের লাশের সারি। স্পেকট্রাম, তাজরিনের পর এবার রানা প-াজা। মানুষের আর্তনাদে সাড়া দিয়েছে সর্বস্তরের মানুষ। শত শত নিহত, পঙ্গু মানুষের এ দুর্দিনে আমরা নীরব থাকে পারি না। আসুন নিজের সামর্থ্য দিয়ে শ্রমিক ভাইদের পাশে দাঁড়াই এবং নিহত-আহত শ্রমিকদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পুনর্বাসনের দাবিতে সোচ্চার হই।

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার : ৩৪১০০৭৫৬, জনতা ব্যাংক লি., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যাম্পাস শাখা

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

বাসদ-এর অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

মার্কসবাদের বিপ্লবী প্রাণসত্ত্বাকে রক্ষা করুন সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম বেগবান করুন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ-এর কেন্দ্রীয় নেতা কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ও কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে সংশোধনবাদ-সংস্কারবাদকে পরাজিত করে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম বেগবান করা এবং শোষণমুক্তির চেতনায় জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে যুক্ত বাম আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। গত ১২ এপ্রিল সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি'র ভিআইপি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ এ কথা বলেন।

দলের অভ্যন্তরে পরিচালিত মতাদর্শিক বিতর্কের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে দলের সারাদেশের **৩৩টি** জেলার নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধি, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম-সহ বিভিন্ন গণসংগঠন ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, দলের সাধারণ সম্পাদকসহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশ দল গড়ে তোলার আদর্শগত ভিত্তিকে সংস্কার ও সংশোধন করছেন যা পার্টির মূল চিন্তা থেকে বিচ্যুতিরই নামান্তর। এমতাবস্থায় দলের আদর্শ, প্রতিষ্ঠাকালীন ঘোষণাকে ধারণ করে এই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী-কে আহ্বায়ক করে কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

জনাকীর্ণ এ সংবাদ সম্মেলনে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, এরপর সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন কমরেড মুবিনুল হায়দার।

সংবাদ সম্মেলনের পূর্ণ বক্তব্য

"শুরুতেই আপনাদের জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। জাতীয় পরিস্থিতির এক সংকটকালে আমরা আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। দেশে ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতা বহির্ভূত বুর্জোয়া দলগুলোর প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার রাজনীতিতে জনগণ অসহায়। সংঘাত ক্রমশ বেড়েই চলেছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে সরকার তার হারিয়ে যাওয়া ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের কাজে লাগাতে চাইছে। অন্যদিকে *(সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

গত ১১-১২ এপ্রিল বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সভার একাংশ। ইনসেটে বক্তব্য রাখছেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

ভারতীয় পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে

সুন্দরবনের পাশে বাগেরহাটের রামপালে কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে সুন্দরবন ধ্বংসের পাঁয়তারা বন্ধের দাবি জানিয়েছে বাসদ। বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী গত ২১ এপ্রিল সংবাদপত্রে দেয়া এক বিবৃতিতে এ দাবি জানান।

বিবৃতিতে বলা হয়, "আমাদের সরকার এমন একটি প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষর করেছে যার ৮৭ ভাগ মালিকানা থাকবে ভারতের হাতে। এই প্রকল্পের কয়লা কিনতে হবে ভারতের কাছ থেকে প্রতি টন ১৭৩ ডলার দামে যেখানে বাংলাদেশের বড়পুকরিয়ার কয়লার দাম প্রতিটন মাত্র ৮৪/৮৫ ডলার। এরপরও এ প্রকল্পে ভারত সরকার যে অর্থ ব্যয় করবে, বাংলাদেশকে সে অর্থের জন্য ১৪ শতাংশ সুদ দিতে হবে। ফলে এ বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুতের দামও পড়বে অনেক বেশি। জানা গেছে, এ চুক্তিতে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য ধরা হয়েছে প্রায় ৮ দশমিক ৫৫ ভারতীয় রুপি, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় হয় ১৪ থেকে ১৫ টাকা। এ দাম কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতোই। অথচ দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিদ্যুতের দাম প্রতি ইউনিট ২ টাকা মাত্র। অর্থাৎ এ প্রকল্প অর্থনৈতিক দিক থেকে আমাদের জন্য মোটেই লাভজনক হবে না। উপরন্তু এ বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে সুন্দরবন ধ্বংসের মুখে পড়বে।"

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, *(সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, কেন্দ্রীয় কনভেশন প্রস্তুতি কমিটি কর্তৃক ২২/১, তোপখানা রোড (ষষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৭৬৩৭৩, ০১৭১১-৮৯৫৮৪৫ E-mail : atikspb80@gmail.com